সবা প্রকাশনী

বিদ্যুৎ মিত্র

সুখ-সমৃদ্ধি

আত্মউন্নয়ন

সুখ-সমৃদ্ধি

বিদ্যুৎ মিত্র

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-6006-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮১৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯৩২০৩

SHUKH-SHAMRIDDHI
By: Biddyut Mura

সেবা প্রকাশনী

আটত্রিশ টাকা

কামনা—
নবীন-প্রবীণ সকল পাঠকের
সুখ-সমৃদ্ধি।

সেবা প্রকাশনী থেকে
প্রকাশিত আত্মোন্নয়নমূলক গ্রন্থ

ধূমপানত্যাগে আত্মসম্মোহন
যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান
স্বর্ণশিখর
কোয়ান্টাম মেথড

প্রজাপতি প্রকাশন থেকে
প্রকাশিত আত্মোন্নয়নমূলক গ্রন্থ

সঠিক নিয়মে লেখাপড়া
আত্ম-উন্নয়ন
মন-নিয়ন্ত্রণ
নিজেকে জানো
আত্মসম্মোহন
জনপ্রিয়তা
কোয়ান্টাম মেথড
চেতনা, অতিচেতনা
জন্মদিন ও আপনার ভাগ্য
সংখ্যা: সৌভাগ্যের চাবিকাঠি
আত্মনির্মাণ

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

ভূমিকা

আপনি সাফল্য চান?

জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে নিজেকে জানতে হবে। নিজেকে জানতে হলে সবচেয়ে আগে জানতে হবে-এ জানার শেষ নেই।

জানা ব্যাপারটার মধ্যে রকমফের আছে। কেউ বেশি জানে, কেউ কম জানে, কেউ আংশিক জানে, আবার কেউ ভুল জানে।

ভুল জানাটা ক্ষতিকর। ভুল জানার চেয়ে না জানা তবু ভালো। গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে সাফল্য জিনিসটা কি এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষেরই সঠিক ধারণা নেই।

অথচ সাফল্য সবাই চায়। সবাই জানতে চায় সাফল্য লাভের সহজ ও নিশ্চিত উপায়।

প্রচলিত ধারণা হলো, সাফল্য লাভের সহজ কোনো উপায় নেই। অমানুষিক পরিশ্রম করো, পৌনঃপুনিক ব্যর্থতার মুখ দেখলেও অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাও, জীবন থেকে বহিষ্কার করো উপভোগ, বিশ্রাম, আনন্দ; দিবারাত্র কাজ করো, কাজ করো আর কাজ করো–এই হচ্ছে সাফল্যের প্রচলিত ফর্মুলা।

অকারণে পুকুরে ঢিল ছোঁড়া পরিশ্রমের কাজ, চেয়ারে বসে পা দোলানোতেও পরিশ্রম হয়–কিন্তু কিছু অর্জিত হয় কি? ব্যর্থ হলে বারবার চেষ্টা চালাতে বলা সহজ, কিন্তু ব্যর্থ যাতে না হতে হয় তার ব্যবস্থাপত্র দেয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। উপভোগ, আনন্দ এবং বিশ্রাম যে জীবনে সাফল্য লাভের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এ-খবর রাখে কজন?

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে মেলামেশা করে একটা ব্যাপার উপলব্ধি করেছি, জীবনে সাফল্য লাভ সম্পর্কে প্রত্যেকেরই

জানার প্রচণ্ড আগ্রহ আছে। সবাই জানতে চায় সাফল্য লাভের সহজ এবং নির্দিষ্ট কোন উপায় আছে কিনা।

প্রশ্নটা নিয়ে দীর্ঘদিন নাড়াচাড়া করেছি। অসংখ্য বই গিলেছি গোগ্রাসে। আমার উদ্দেশ্য ছিলো সাফল্য লাভের জন্যে একটা সহজ ফর্মুলা আবিষ্কার করা। কাজটায় নেমেই দেখলাম অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য সম্পর্কে আমাদের ধারণাই ভুল। সাফল্য কি তাই আমরা অধিকাংশ মানুষ জানি না। আরো আবিষ্কার করলাম, সাফল্য অর্জনের সহজ উপায় অবশ্যই আছে।

আপনি সাফল্য চান। যদি না চান, এ বই আপনার জন্যে নয়।

এই বইয়ে আমি নিশ্চিত সাফল্য লাভের একটি সহজ ফর্মুলা প্রকাশ করছি। এই যাদুবিদ্যার সাহায্যে আপনি সুখ অর্জন করবেন, পাবেন আরো টাকা, আরো সম্মান, পূরণ করবেন আপনার মনের সবগুলো শখ-সাধ-ইচ্ছা-অভিলাষ। এই বইতে যে ফর্মুলা আপনি শিখবেন সেটিকে আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ বলতে পারেন।

ফর্মুলাটা যে সত্যি কাজের, বুজরুকি বা ধোঁকাবাজি নয় তার সবচেয়ে বড় সাক্ষী আমি, বিদ্যুৎ মিত্র। এই ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি আমি।

আপনিও পাবেন।

বইটিকে লুকিয়ে ফেলবার কথা ভাবছেন বুঝি? ভাবছেন আর কেউ যদি ম্যাজিক ফর্মুলাটা শিখে নিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যায়, আপনার ভাগে কম পড়ে যাবে? না, সে ভয় নেই। এই ফর্মুলা আপনাকে যে গুপ্তধনের সন্ধান দেবে তার সীমা-পরিসীমা নেই। সেখানে আছে অঢেল, অফুরন্ত ধনের ভাণ্ডার। পৃথিবীর চারশো কোটি মানুষ অবিরাম একশো বছর ধরে সেই ভাণ্ডার লুট করলেও এর ধনরাশি ফুরাবার নয়।

তার মানে, আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন না।

নিশ্চিন্তে মন দিন এবার বইয়ের পাতায়।

সাফল্য একটি ভ্রমণ

সাফল্য কি? সাফল্য কি একটি লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থান?

ঢাকা থেকে লঞ্চযোগে আপনি বরিশাল যাবেন। বরিশাল আপনার গন্তব্যস্থান। বরিশালে পৌঁছুলেই আপনার যাত্রা শেষ। কি দাঁড়ালো ব্যাপারটা তাহলে? নির্দিষ্ট একটা জায়গা বা লক্ষ্যের নাম গন্তব্যস্থান। সাফল্যকে যদি গন্তব্যস্থান বলে মনে করি, তাহলে নির্দিষ্ট জায়গা বা লক্ষ্যে পৌঁছেই ভাবতে পারি, আমি সফল হয়েছি। কিন্তু আসলে কি তাই? কোনো জিনিস অর্জনের মধ্যেই কি সাফল্য সীমিত বা নিহিত?

আসুন, বিশ্লেষণ করা যাক।

ধরুন, আপনি সুনাম চান। সমাজ-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা দিয়ে, বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করে, মানুষকে সৎ পরামর্শ দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুনাম অর্জনও করলেন। যতোটুকু সুনাম অর্জন করলেন, তাতেই কি আপনি সন্তুষ্ট, তাই কি আপনার জন্যে যথেষ্ট? না, তা কখনো হতে পারে না। আপনি আরো সুনাম চাইবেন, আরো সম্মান আশা করবেন। যদি না চান, না আশা করেন–কি হবে? আপনার সুনাম অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, শুধু তাই নয়, যে সুনামটুকু খাটাখাটনি এবং ত্যাগ স্বীকার করে অর্জন করেছেন তাও নষ্ট হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে ক্রমশ।

অর্জিত সুনামটুকু ধরে রাখার উপায় কি? উপায়–এগিয়ে যাওয়া। যে পথে চলেছেন সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে আপনাকে, অর্থাৎ আরো সুনাম অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। শুধুমাত্র এই চেষ্টার মাধ্যমেই আপনি পূর্ব-অর্জিত সুনাম ধরে রাখতে পারবেন এবং আরো বেশি

সুনাম অর্জন করতে পারবেন।

বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা শিখলাম: সাফল্য কোনো নির্দিষ্ট জিনিস পাওয়ার মধ্যে বা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যে পৌঁছার মধ্যে সীমিত বা নিহিত নয়। লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থান একটা নির্দিষ্ট বিন্দু, সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু সাফল্যের সীমা নেই, সাফল্যের ক্ষেত্র সীমারেখাহীন।

গন্তব্যস্থান থাকলেই সেখানে পৌঁছুবার প্রশ্ন উঠছে। কোথাও পৌঁছুতে হলে কি করতে হয় আপনাকে? হাঁটতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়। সাফল্যকে গন্তব্যস্থান মনে করলে রাস্তাটা দুর্গম, চড়াই উতরাইবহুল, কণ্টকাকীর্ণ-এরকম মনে হবে। রাস্তাটা দীর্ঘ, এবড়োখেবড়ো, বিপদ-সঙ্কুল হবে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর ব্যাপারটা নীরস, কষ্টকর একটা কাজ। কিন্তু সাফল্যকে গন্তব্যস্থান মনে না করে যদি মনে করা হয় ভ্রমণ? কি তারতম্য ঘটছে? একটা উদাহরণ ব্যবহার করে ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

ধরুন, কোচযোগে চট্টগ্রাম, ওখান থেকে রাঙ্গামাটিতে বেড়াতে যাবেন। আপনার আনন্দ কি শুরু হবে রাঙ্গামাটিতে পৌঁছুবার পর? মোটেই না। যাবেন-এই সিদ্ধান্ত নেবার পর থেকেই আপনি পুলক অনুভব করবেন। অগ্রিম টিকেট কিনতে আপনি বি. আর. টি. সি-র স্টেশনে যাবেন। এই যাওয়াতেও আনন্দ। যাত্রার খুঁটিনাটি বিষয়াদি নিয়ে স্টেশনের কর্মচারীদের সাথে আলাপ করার সময় অনুভব করবেন রোমাঞ্চ। ব্যাগ-ব্যাগেজ ঠিকঠাক করার সময়ও শিহরণ অনুভব করবেন। কাপড়-চোপড়, নানা রকম প্রয়োজনীয় জিনিস একটি একটি করে ব্যাগে ভরবেন আর কল্পনায় দেখবেন চট্টগ্রামে পৌঁছে এই শার্টটা গায়ে দিচ্ছেন বা ওই শাড়িটা পরছেন, রাঙ্গামাটি পৌঁছে অমুক জায়গায় যাবেন ওই জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে–এসবই আনন্দ জোগাবে আপনাকে। যাত্রার আগে বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ীদের সাথে দেখা করে বিদায় নেবেন। আপনার চারপাশে একটা হাসিখুশির পরিবেশ পাবেন

আপনি। হাসি-ঠাট্টা হবে, কারণে অকারণে হোঃ-হোঃ হাসবেন আপনি। কোচ রওনা হবে। অন্যান্য যাত্রীদের সাথে পরিচয় হবে, গল্পগুজব জমে উঠবে তাদের সাথে। পথের দু'পাশের দৃশ্যাবলী দেখে বৈচিত্র্যের স্বাদ পাবেন। উপভোগ করবেন শ্যামল বাংলার দিগন্ত বিস্তৃত ধানখেতের হিল্লোল। নির্দিষ্ট সময়ে চট্টগ্রামে পৌঁছুলেন, তারপর ওখান থেকে রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটিতে পৌঁছুবার সাথে সাথে কি আপনার আনন্দ শেষ হয়ে গেল? কক্ষনো না! মাত্র তো পৌঁছুলেন, থাকবেন বেশ ক'টা দিন। যে-কদিন থাকবেন, আনন্দ আর আনন্দ আর আনন্দ করবেন। এখানে বেড়াবেন, ওখানে বেড়াবেন। কতো কি দেখবেন। এক সময় বেড়ানো শেষ হবে। বেড়ানোর শেষ মানে কি আনন্দেরও শেষ? না। ফেরার সময়ও আনন্দ কম নয়। ফিরে এলেন, কিন্তু স্মৃতিটা কি রইলো না? স্মৃতি রোমন্থন করে এরপরও কি আপনি আনন্দ পাবেন না?

কেন এতো আনন্দ হয়? কারণ, এটা ভ্রমণ। ভ্রমণে একঘেয়েমি নেই। সাফল্যও একটি ভ্রমণ। যে-মুহূর্ত থেকে আপনি সাফল্য লাভ করার সিদ্ধান্ত নিলেন সে-মুহূর্ত থেকে শুরু হলো আপনার ভ্রমণ। এবং ভ্রমণ মানেই শুরু থেকে আনন্দ, রোমাঞ্চ, পুলক এবং শিহরণ।

ভ্রমণে চলুন। আনন্দের ছোঁয়া পাচ্ছেন না প্রস্তাবটা পাওয়া মাত্র? ভ্রমণ শরীর ও মনের জন্যে একটা টনিক। ভ্রমণে আছে নতুন নতুন জিনিস দেখার, শেখার, অর্জন করার অনির্বচনীয় আনন্দ। আছে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ। আছে অচেনাকে চেনার, অজানাকে জানার সুযোগ।

বেঁচে থাকার অপর নাম সৃষ্টি করা

সৃষ্টি উৎপাদনশীল। এবং সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তিমূল। মানুষ যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি বা উৎপাদনমূলক কাজে লেগে না থাকে, প্রকৃতির আইন-কানুনের সাথে তার বিরোধ লেগে যাবে। টিকে থাকাই হয়ে পড়বে দুষ্কর।

শুধুমাত্র সাফল্য অর্জনে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। কোথাও পৌঁছুতে চান-খেটেখুটে, গলদঘর্ম হয়ে, চোখকান বুজে গন্তব্যস্থানের দিকে ছুটলেন, অন্য কোনো দিকে খেয়াল রাখলেন না, পৌঁছানোটাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছুলেন সেখানে– তারপর? পিছন ফিরে তাকান একবার। দীর্ঘ, দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন, কিন্তু চিহ্ন কি রেখে এসেছেন কিছু? কিংবা, সাথে করে কি এনেছেন কিছু যা নিজের তৈরি? আপনার থলেতে কিছু সংগ্রহ করেছেন কি? পথে একটি গাছের চারাও কি পুঁতে আসেননি? এতোদিন ধরে এতো পরিশ্রম করলেন, কিছুই কি উৎপাদন করেননি?

সব প্রশ্নের উত্তর যদি না-সূচক হয়, আপনার সাফল্য লাভে আনন্দ কোথায়?

আসলে সৃষ্টির মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে আপনাকে। আপনাকে সৃষ্টিশীল হতে হবে। তাতে আনন্দ পাবেন প্রচুর। সৃষ্টিশীল হোন, এগিয়ে যেতে একঘেয়েমির শিকার হতে হবে না। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে উল্লসিত হবেন আপনি শুরু থেকেই।

বিশেষ একটি অনুরোধ

অনুরোধ করছি: এই বইটি যে বিশেষ ভাবে আপনার জন্যে লেখা হয়েছে, এই কথাটি মনে গেঁথে নিন। বিশেষ করে আপনার জন্যেই লিখেছি এই বই। এর প্রতিটি পরিচ্ছেদ, প্রতিটি প্যারা, সবগুলো বাক্য এবং প্রত্যেকটি শব্দ আপনার উদ্দেশ্যে রচিত। আর কেউ এই বই পড়ছে কি না পড়ছে, দেখবার দরকার নেই আপনার। তাদের জন্যে লেখা হয়নি এই বই। আপনার জানা দরকার, এ বইটি লেখা হয়েছে শুধুমাত্র আপনার জন্যে।

আপনি এবং আমি, আমরা মাত্র দু'জন-কাছেপিঠে আর কেউ নেই। আমি আপনাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভের সহজতম উপায় জানিয়ে দিচ্ছি। আপনি শিখে নিচ্ছেন।

এবার, বিশেষ একটি অনুরোধ করবো। যে-সব উপায় আপনাকে

জানাবো সেগুলো যদি গুরুত্বের সাথে কাজে লাগাতে না চান, দয়া করে এরপর আর একটি লাইনও পড়বেন না। আমি প্রতিশ্রুতি চাই, এই ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে আপনি প্রাচুর্যের রাজ্যে প্রবেশ করবেন। তা নইলে ব্যর্থ হয়ে যাবে এ বই রচনার উদ্দেশ্য।

আমি পারবো বনাম আমি করবো

সাফল্য এবং ব্যর্থতার মধ্যে ফারাকটা কোথায়? ফারাক মনোভাবের। কেউ ভাবে, আমি পারবো না। সে ব্যর্থ। সে কেন ব্যর্থ? কারণ; সে চেষ্টা করে না, চেষ্টা করার আগেই জানিয়ে দেয়, সে পারবে না। যে চেষ্টা করে না তার দ্বারা পারা সম্ভব নয়–সত্যি কথা।

আবার যে ভাবে, আমি পারবো–সে পারে। সে কেন পারে? কারণ, সে চেষ্টা করে। চেষ্টা করলে পারা যায়। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। এটাও একটা প্রমাণিত সত্য।

চেষ্টা করলে সব পারা যায়। আপনার দ্বারা সম্ভব নয় এমন কোনো কাজ নেই। অসম্ভব কাজ কোনটিকে বলবেন আপনি? ধরুন, আজ আপনার বয়স চল্লিশের উপর। লেখাপড়া তেমন শেখেননি, সুযোগ-সুবিধে পাননি বলে। এখন আপনার ইচ্ছা, লেখাপড়া শিখবেন। এই বয়সে লেখাপড়া শিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা, স্বীকার করি। অনেক বাধা পাবেন, তাও সত্যি। কেউ কেউ হাসবে, ব্যঙ্গ করে লজ্জা দেবার চেষ্টা করবে আপনাকে। আপনার স্ত্রীই হয়তো বলবেন, বুড়ো বয়সে ভিমরতিতে ধরেছে। বইপত্রের দোকানে ঘনঘন ছুটতে হবে আপনাকে, সময় খরচ করে ঢুঁ মারতে হবে লাইব্রেরীগুলোয়, আপনার ছেলের বয়সী কোনো পাকা ছাত্রকে হয়তো প্রাইভেট টিউটর হিসেবে পাবার দরকার হতে পারে আপনার, তার জন্যে কিছু অতিরিক্ত টাকা চাই–এই ধরনের প্রতিটি ব্যাপারই আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক একটা মস্ত বাধা। এই বাধাগুলোর কথা মনে হলেই আপনি যদি বলেন, নাহ্, এই বয়সে আর সম্ভব নয়-তাহলে ভুল করবেন। আসুন, দেখা যাক বিচার করে, এই বাধাগুলোকে জয় করা সম্ভব কিনা।

লোকে ব্যঙ্গ করবে, করুক–আপনি কান দেবেন না। আপনার উদ্দেশ্যের প্রতি আপনি অবিচল থাকুন। এক নম্বর বাধাটা সরে যাচ্ছে এতে করে।

সময়ের অভাব, এটা হতে পারে আপনার দু'নম্বর বাধা। চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন। পুরো একদিন অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা আপনি পরিশ্রম করেন না, তাই না? আট ঘণ্টা ঘুমান, আট ঘণ্টা কাজ করেন, বাকি আট ঘণ্টা বিশ্রাম, প্রাত্যহিক কাজকর্ম, খাওয়া, খেলাধুলা ইত্যাদির জন্যে নির্ধারিত। বিশ্রামের সময় থেকে আধঘণ্টা, খেলাধুলার সময় থেকে আধঘণ্টা এবং ঘুমের সময় থেকে আধঘণ্টা করে মোট দেড় ঘণ্টা আদায় করুন। খেলা, বিশ্রাম এবং ঘুমের কোনো গুরুতর ক্ষতি না করে এই সময় আদায় করা সম্ভব। এইভাবে মাসে পাচ্ছেন আপনি পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা। প্রতিমাসে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা লেখাপড়ার কাজে ব্যয় করতে পারছেন আপনি। দূর হলো দু'নম্বর বাধা।

এইভাবে এক এক করে বাধাগুলোকে টপকাতে চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করলে পারবেন।

আমি পারবো–এটা একটা ঘোষণা। এটা আত্মবিশ্বাসেরও লক্ষণ। যদি ভাবেন, আমি এ কাজ পারবো না–সেটা করার জন্যে কি আপনি চেষ্টা করবেন? করবেন না। যেটা পাওয়া সম্ভব নয় সেটা পাবার জন্যে কেউ চেষ্টা করে না। যে চেষ্টা করে না সে পারে না।

কি দাঁড়ালো? চেষ্টা করার আগে আপনাকে জানতে হবে, আপনি পারবেন। কাজটা যতোই কঠিন হোক, মানসচক্ষে যতো বাধাই আপনি চাক্ষুষ করুন, মনের জোর খাটিয়ে ঘোষণা করুন–আমি পারবো। বিশ্বাস করুন, এই ঘোষণার দ্বারা আপনি যে কাজটি করতে চান তার অর্ধেক সম্পন্ন করে ফেলেছেন।

কাজকে ভয় করবেন না। নিজের যোগ্যতাকে ছোটো করে দেখবেন না। কোনো কাজ করতে গিয়ে যদি দেখেন সত্যি সত্যি আপনার যোগ্যতার অভাব রয়েছে তাহলে আমি পারবো না এই কথা না বলে যোগ্যতা অর্জন করার চেষ্টা করুন এবং আমি পারবো না এই

কথা না বলে বলুন আমি পারবো। সাফল্যের মূলমন্ত্রই হলো–আমি পারবো। আপনি যদি সাফল্য চান, আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে আপনি সফল হতে পারবেন। এই জানাটা একান্তই প্রয়োজনীয়। আমি পারবো–এটা একটা বিশ্বাস। খুবই মূল্যবান বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আপনার মধ্যে থাকতেই হবে।

এখন দেখা যাক, আমি পারবো এবং আমি করবো-দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি।

কোনো কাজ আপনি করতে পারবেন একথা জানা আর সেই কাজটা করা, দুটো আলাদা ব্যাপার। আপনি জানেন আপনি করতে পারবেন–কাজটা সম্পন্ন করা আপনার দ্বারা সম্ভব। এই জানার সাথে করার দূরত্ব আকাশ পাতালের।

পারবেন এই বিশ্বাস নিয়ে কোনো কাজ করতে চাইলে তা আপনি করতে পারবেন। আপনি চাকরিতে উন্নতি করতে পারবেন। আপনি লেখাপড়া শিখতে পারবেন। আপনি বড় একজন লেখক হতে পারবেন। ডাক্তার, আইনবিদ, এঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন। কিন্তু হবেন কি? আপনি করতে পারেন না এমন কিছু নেই–কিন্তু করবেন কি? এইটাই হলো সংকল্প-নির্ধারক প্রশ্ন।

আমি পারবো–এটা ঘোষণা করে আপনি জানিয়েছেন আপনার যোগ্যতার অভাব নেই। যদি থাকে, তা পূরণ করে নেবেন।

আমি পারবো–এই বিশ্বাস প্রকাশ করে আপনি জানিয়েছেন প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস আপনার মধ্যে আছে।

সেই সাথে আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন–চেষ্টা করবেন।

এখন আপনার যোগ্যতার প্রমাণ চাই। দেখতে চাই আপনার আত্ম-বিশ্বাসের নমুনা। চাক্ষুষ করতে চাই প্রতিশ্রুতি পালন করেন কিনা।

অর্থাৎ এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে–আমি করবো।

আমি করবো–এটা একটা সংকল্প।

আমি পারবো এই সচেতনতা যে-কোনো কাজের ব্যাপারে একান্ত

প্রয়োজনীয়, আপনার মধ্যে থাকতেই হবে। আর আমি করবো এই সংকল্প যে-কোনো কাজ সম্পন্ন করার চাবিকাঠি, ট্রিগার। দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে-কোনো একটির অভাবে অন্যটি অচল।

রফিক চৌধুরীর কথা ধরুন। শিক্ষিত, বুদ্ধিমান যুবক। যথেষ্ট জ্ঞান রাখে। প্রচুর পড়াশোনাও করে। নাটক, উপন্যাস, রহস্যোপন্যাস, প্রবন্ধ-যা পায় তাই পড়ে এবং পড়া শেষ করে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বইটা, বলে, যাচ্ছে তাই! এর চেয়ে ভালো আমিই লিখতে পারি।

লিখতে পারি-এই বিশ্বাস রফিক চৌধুরীর মধ্যে রয়েছে। আসলেও সে হয়তো লিখতে পারবে। কিন্তু লিখছে না। কেন লিখছে না? লিখবো–এই সংকল্প নেই তার মধ্যে, তাই। সংকল্পটি নেই বলে তার লিখতে পারি এই বিশ্বাসটিরও কোনো মূল্য নেই। লিখতে পারি, বা হতে পাত্তেম–এই কথাটি বলেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ওকে, লেখা ওর দ্বারা কোনো দিনই সম্ভব হবে না। অবশ্য, লিখবো এই সংকল্প ও যদি কখনো গ্রহণ করে তাহলে অন্য কথা।

অপর দিকে, সুলতান আহমেদের কথা ধরুন। রফিক চৌধুরীর চেয়ে বিদ্যা-বুদ্ধিতে কম যায় না সে-ও। পড়াশোনা রফিক চৌধুরীর চেয়েও বেশি। নানা বিষয়ে যোগ্য যুবক সে। একবার উঠে পড়ে লাগলো ব্যবসা করবে বলে। টাকা যোগাড়, কারখানার জন্যে জায়গা নির্বাচন, শ্রমিক নিয়োগ, উৎপাদিত পণ্যের বাজার তৈরি–ইত্যাদি কাজে কয়েকদিন ব্যস্ত থাকার পর হঠাৎ কি যে হলো, হাত-পা গুটিয়ে ফেলে বলে বসলো-দূর! আমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না!

এই রকম একবার নয়, বহু কাজে বহুবার হাত দিয়ে খানিকটা করে এগিয়ে হঠাৎ থেমে গেছে সুলতান আহমেদ, বলেছে, আমার দ্বারা হবে না!

সুলতান আহমেদের আমার দ্বারা হবে না বলবার কারণ কি?

পারবো–এই আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে ওর মধ্যে। যতোদিন এই বিশ্বাসের অভাব ওর মধ্যে থাকবে, ততোদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে ওর জীবনে।

রফিক চৌধুরীর মধ্যে নেই আমি করবো এই সংকল্প, তাই আমি পারবো এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সে ব্যর্থ। অপরদিকে সুলতান আহমেদের মধ্যে নেই আমি পারবো এই বিশ্বাস, তাই আমি করবো এই সংকল্প তার মধ্যে দেখা গেলেও সে ব্যর্থ।

তার মানে, আমি পারবো এবং আমি করবো এই দুটোই আপনার মধ্যে থাকতে হবে, তবেই আপনি সফল হবেন।

অনেকে অনেক কিছুই করতে চায়। রফিক চৌধুরী এবং সুলতান আহমেদের মতো যুবক আমাদের দেশে হাজারে হাজারে আছে। আপনি নিজের কথাই ভেবে দেখুন না। কতো কি করার, কতো কি হবার ইচ্ছাই না আছে আপনার মধ্যে। কিন্তু আজও করতে পারেননি, হতে পারেননি। কেন? খতিয়ে ভেবে দেখুন, হয় আপনার মধ্যে আমি পারবো এই বিশ্বাসের, নয়তো আমি করবো এই সংকল্পের অভাব আছে। হয় দুটোরই, নয়তো যে-কোনো একটির অভাব আছে বলে আপনি তেমন কিছু করতে পারেননি, হতে পারেননি।

লক্ষ্যস্থির করুন

অর্থাৎ যা করতে চান তা আগে নির্ধারণ করতে হবে। কেউ উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, কেউ ব্যবসা করতে চায়, কেউ নেতা হতে চায়, কেউ আবার লেখক হতে চায়। হতে চাওয়া এবং করতে চাওয়ার শেষ নেই। আপনি কি হতে চান? কি করার ইচ্ছা আপনার? সেটা স্থির করে নিন আগে।

যে কাজটি করতে চান তা নির্ধারণ করুন, তারপর নিজের মধ্যে এই বিশ্বাস আনুন যে কাজটা আপনি করতে পারবেন, এরপর 'আমি করবো' এই সংকল্পে অটল হোন, দেখবেন আশ্চর্য সব অনুকূল ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে।

আপনার অবস্থান এবং আপনার লক্ষ্যবস্তুর অবস্থানের মধ্যবর্তী দূরত্বটা মেপে নিন, মাঝখানে যে-সব বাধা আছে সেগুলো এক এক করে দেখে নিন, বুঝে নিন। প্রত্যেকটি বাধাকে পরিষ্কার চিনে নিতে

হবে আপনার। বাধাগুলো কি কি তা যদি আপনি না জানেন, ওগুলোকে টপকাবেন কিভাবে? বাধাগুলোকে শত্রু বলে মনে করুন। তবে আপনার তুলনায় এইসব শত্রুগুলো নিতান্তই দুর্বল, ইচ্ছা করলেই আপনি এদের প্রত্যেকটিকে ঘায়েল করতে পারেন-মনে রাখবেন কথাটা।

বাধা বা শত্রুর চেনার কাজ শেষ করুন। তারপর? একযোগে শত্রুদলকে সংহার করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন নাকি? না। একবার একটি বাধাকে ধরুন। ওটাকে পথ থেকে সরান। তারপর দ্বিতীয় বাধাটিকে ধরুন, সরান ওটিকেও। এইভাবে এগোন, একটি একটি করে বাধাগুলোকে সরিয়ে দিন।

কিন্তু একটি একটি করে তো সরাবেন, আগে সরাবেন কোন্‌টিকে? তাও ঠিক করে নিতে হবে আপনাকে আগেভাগে। বাধাগুলোকে এক এক করে লিখে নিতে হবে আপনার নোটবুকে। সংখ্যায় হয়তো দশটা কিংবা বিশটা হবে বাধাগুলো। ধরুন বিশটা। এই বিশটা বাধাকে এক এক করে টপকাবার বা সরাবার জন্যে কি করতে হবে আপনাকে?

তৈরি করতে হবে সক্রিয় তৎপরতামূলক একটি কর্মসূচী। এ বিষয়ে অন্য পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করবো।

মানুষ কেন ব্যর্থ হয়

সাফল্যলাভ করতে চায় না এমন লোক নেই। সবাই চায়। চেষ্টাও করে অনেকে। কেউ কেউ প্রাণপণ চেষ্টা করতেও কসুর করে না। সাফল্যলাভ করার উপায় সম্পর্কেও এদের কারো কারো বেশ ভালো ধারণা আছে। তবু, এদের মধ্যে থেকে অধিকাংশ লোক ব্যর্থ হয়।

কেন?

ব্যর্থতার কারণ হিসেবে এরা এক হাজার একটা কারণ দেখায়, যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে, উপায়টা সকলের জন্যে সব পরিস্থিতিতে কার্যকরী নয়।

আমি পারবো এই বিশ্বাস এবং আমি করবো এই সংকল্প এদের

মধ্যে থাকলেও এরা ব্যর্থ হয়। কারণটা খুঁজে বের করা দরকার। তা না হলে প্রশ্ন দেখা দেবে: সাফল্যলাভের সহজ কেন, আদৌ কোনো নির্দিষ্ট উপায় (ফর্মুলা) আছে, না নেই?

একটা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা যাক।

ধরুন, একটি প্রাইভেট কার নিয়ে আপনি বহুদূর কোথাও যাচ্ছেন (প্রাইভেট কার আমাদের দেশে খুব কম লোকেরই আছে, হয়তো আপনারও নেই। তবু, উদাহরণের মধ্যে প্রাইভেট কার আমদানী করছি এই জন্যে যে এই বই পড়ে যা শিখবেন তা কাজে লাগিয়ে আপনি ভবিষ্যতে একটা নিজস্ব গাড়ির মালিক হতে পারবেন অনায়াসে, এই বিশ্বাস আমি রাখি)। যাত্রাটাকে সফল করার স্বার্থে আপনি প্রথমেই চেক করে নেবেন গাড়িটা ত্রুটিমুক্ত কিনা। ব্রেক, টায়ার, হেডলাইট, হর্ন–এক এক করে সব পরীক্ষা করে দেখবেন। গাড়ি চালাবার সময় আপনি খুবই সতর্কতার সাথে, মনোযোগ দিয়ে চালাবেন, যাতে কোনোরকম দুর্ঘটনা না ঘটে। কি ধরনের পোশাক পরবেন আপনি, সাথে কি পরিমাণ টাকা নেবেন–এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে আপনাকে। পথিমধ্যে অপ্রত্যাশিত কোনো বিপদ ঘটতে পারে, তেমন কিছু ঘটলে সামলে নেবার মতো উপস্থিত বুদ্ধি এবং মানসিক প্রস্তুতি থাকবে আপনার মধ্যে। গাড়ি চালিয়ে কখন ক'টার সময় ঠিক কোন্ জায়গায় আপনি পৌঁছুবেন, কোথায় দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেবেন, ফেরীঘাটে ঠিক কখন পৌঁছুলে সময়ের অপব্যয় থেকে বাঁচবেন–এই ধরনের অনেক ব্যাপারে আপনি আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন। অর্থাৎ আপনি সুপরিকল্পিত ভাবে রওনা হবেন। তবেই না আপনার যাত্রা সফল হবে। তা নইলে হাজারো অসুবিধে চেপে ধরবে আপনাকে চারদিক থেকে। কি দাঁড়ালো তাহলে মোদ্দা ব্যাপারটা? ভ্রমণে বেরুবার আগে আপনার মধ্যে 'আমি পারবো' এবং 'আমি করবো' এই দৃঢ় সংকল্প থাকলেই চলছে না, যাত্রাটাকে সফল করার জন্যে একান্ত ভাবেই দরকার হচ্ছে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির। আপনাকে এক এক করে

সবগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রত্যেকটি ব্যর্থতার পিছনে কারণ থাকে। সাফল্যলাভ ভাগ্যের ব্যাপার নয়। প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের নাম সাফল্য। কেউ যদি ব্যর্থ হয় তাহলে চোখ বুজে বলে দেয়া যায় সাফল্য অর্জনের জন্যে যা যা করা একান্তভাবে জরুরী ছিলো সেগুলো সে করেনি।

আমরা তাহলে শিখলাম:

(ক) আমি পারবো–এই বিশ্বাস আপনার মধ্যে থাকতেই হবে। এই বিশ্বাস যদি আপনার মধ্যে না থাকে আপনার দশা হবে সুলতান আহমেদের মতো, কোনো কাজে হাত দিলেও তা কক্ষনো শেষ করতে পারবেন না।

(খ) আমি করবো–এই দৃঢ় সংকল্প আপনার মধ্যে না থাকলে চলবে না। যে-কোনো কাজ করার জন্যে যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ না করেন, কাজটায় কোনোদিনই হাত দিতে পারবেন না। রফিক চৌধুরীর মতো 'পারবো' বলেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আপনাকে, পারা আর আপনার দ্বারা সম্ভব হবে না।

(গ) আমি পারবো, আমি করবো–এই বিশ্বাস এবং সংকল্প আপনার মধ্যে আছে, কিন্তু এ দুটোই যথেষ্ট নয়। কোনো কাজ সম্পন্ন করতে হলে দরকার হচ্ছে কাজটায় হাত দেয়ার। বিশ্বাসও রয়েছে আপনার মধ্যে, কাজটা করবেন সে প্রতিজ্ঞাও করেছেন–কিন্তু এ দুটোর সাথে কাজটার হাত দেয়ার সম্পর্ক কি? বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই, যতোক্ষণ আপনি কাজটা করার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে একটা সক্রিয় তৎপরতামূলক কর্মসূচী রচনা করে কাজে না নামছেন।

ধরুন, আপনি একজন ছাত্র। ফাইনাল পরীক্ষার আর মাত্র তিনমাস বাকি। স্থির করলেন পরীক্ষায় আপনাকে ইংরেজি, ইকনমিকস এবং জিয়োগ্রাফীতে স্টার মার্ক পেতে হবে। সারা বছর ধরে পড়াশোনা যা করেছেন তা যথেষ্ট নয়। স্টার মার্ক পেতে হলে আপনাকে প্রত্যেকদিন অতিরিক্ত আরো চারঘণ্টা করে পড়াশোনা করতে হবে। সময়ের অভাব নেই আপনার, যদি বা থাকে, অন্যান্য

কাজ থেকে সময় আদায় করে এই চারঘণ্টা বের করে নিতে পারবেন আপনি। আপনার দৃঢ় বিশ্বাস–স্টার মার্ক পাবেন আপনি অর্থাৎ নিজেকে আপনি বললেন–আমি পারবো।

এরপর দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন আপনি–আমি করবো।

এতেই কি স্টার মার্ক পাবেন বলে আশা করেন? না, তা আপনি আশা করতে পারেন না। বিশ্বাস এবং সংকল্প দ্বারা আপনি শুধুমাত্র মনকে সম্মত ও প্রস্তুত করলেন। এবার আসল কাজ।

আপনার বর্তমান পড়াশোনা এবং আবশ্যক পড়াশোনা অর্থাৎ আপনার বর্তমান অবস্থান এবং লক্ষ্যবস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব মেপে নিতে হবে আপনাকে, মধ্যবর্তী বাধাবিঘ্নগুলোকে এক এক করে চিনে নিতে হবে, তারপর সক্রিয় তৎপরতামূলক একটা কর্মসূচী তৈরি করে বাধাগুলোকে এক এক করে টপকাবার কাজে হাত দিতে হবে।

সময়ের অভাব–এটা একটা বাধা হতে পারে। আগেই উল্লেখ করেছি এ-বাধা টপকাবার জন্যে কি করতে হবে আপনাকে।

বইয়ের অভাব–এটা হতে পারে আপনার দু'নম্বর বাধা। এই বাধাকে দূর করার জন্যে লাইব্রেরীতে যাবেন আপনি, সহপাঠীদের কাছ থেকে বই ধার নেবেন বা নোট সংগ্রহ করবেন।

শারীরিক দুর্বলতা–এটা হতে পারে আপনার তিন নম্বর বাধা। রাত জেগে পড়াশোনা করতে হবে হয়তো আপনাকে, তাই শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হবে। শরীর সুস্থ রাখার জন্যে ভালো খাওয়া-দাওয়া, উপযুক্ত ব্যায়াম এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দরকার হবে আপনার। বিশ্রামের জন্যে সময় ধার করতে হবে আপনার অন্যান্য কাজ থেকে। সময়ের একটা বাজেট করে নিন, বিশ্রামের সময় পেয়ে যাবেন।

এইভাবে একটি একটি করে বাধাগুলোকে ধরুন, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলোকে টপকান। আসলে বাধাগুলোকে টপকাবার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরীক্ষায় আপনার স্টার মার্ক পাবার মূল রহস্য। আপনি যদি বাধাগুলোকে টপকাতে পারেন, সত্যিই স্টার মার্ক পাবেন।

কয়েক প্রকার বস্তু একত্রিত করলে অন্য এক বস্তু তৈরি হয়। সন্দেশের কথা ধরুন। ছানা এবং চিনি একত্রিত করলে সন্দেশ হয়। ছানা এবং চিনি সন্দেশের উপাদান। যে-কোনো জিনিসই উপাদানের সমষ্টিমাত্র। বস্তুর যেমন উপাদান আছে তেমনি বিষয়েরও উপাদান আছে। সাফল্য একটি বিষয়। সাফল্যের উপাদান কি কি?

সাফল্যের উপাদান

সাফল্যের মৌলিক উপাদান তিনটি। কি কি?

ক) আমি পারবো–এই বিশ্বাস।

খ) আমি করবো–এই সংকল্প।

গ) সক্রিয় তৎপরতামূলক একটি কর্মসূচীর বাস্তবায়ন।

বর্তমান অবস্থায় যদি সন্তুষ্ট থাকেন

সেক্ষেত্রে এই বই পড়বার দরকার নেই আপনার। অবশ্য আপনি নিজেকে সন্তুষ্ট মনে করলেও আপনার মনে করাটা সত্য কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবু, আপনি যদি আপনার বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হন, যদি সব শখ-সাধ-ইচ্ছা-অভিলাষ-উদ্দেশ্য-বাসনা আপনার পূরণ হয়ে গিয়ে থাকে, উন্নতি করার বা সমৃদ্ধি অর্জনের যদি কোনো প্রয়োজন বোধ না করেন তাহলে এই বই আপনার জন্যে নয়। তবে, অনুরোধ করবো, বইটা হাতছাড়া করবেন না। কারণ, যা কিছু অর্জন করেছেন তাতেই আপনি সন্তুষ্ট, আরো সাফল্য, আরো সমৃদ্ধি অর্জন করার ইচ্ছা আপনার নেই–তাই, চেষ্টাও করবেন না, ফলে, অর্জিত যা কিছু আছে সব বাসি হয়ে যাবে ক'দিনেই, ওসবে আর মজা পাবেন না তেমন, নতুন কিছু চাইবে আপনার মন। তখন দরকার হবে আপনার এই বইটি।

আপনি যদি টাকা পয়সার ব্যাপারে অভাবগ্রস্ত হন বা আরো টাকা রোজগার করতে চান, যদি আপনার শখ-সাধ-উচ্চাভিলাষ পূর্ণ না হয়ে থাকে, সমাজে সম্মান এবং শ্রদ্ধার আসনে যদি আপনি প্রতিষ্ঠিত না

হয়ে থাকেন, আপনার প্রতিটি নতুন প্রভাত যদি আনন্দ এবং প্রেরণাদায়ক না হয় তাহলে যে বই আপনার হাতে রয়েছে, এই বইটি আপনার অত্যন্ত দরকার, এটাই আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি। বিশ্বাস করুন, এই বই-ই উত্তরণের তুঙ্গে পৌঁছে দেবে আপনাকে।

জীবন আপনার সাথে বেঈমানী করেছে। তাই কি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভুগছেন? আমার কথা শুনুন, ভুলে যান সব। মনটাকে হালকা করুন। সব ভুলে হাসতে চেষ্টা করুন একবার। নিজেকে সুখী ও সফল একজন মানুষ বলে মনে করুন। সামনে আপনার বিপদ, কণ্টকাকীর্ণ পথ, হাজার রকম বাধাবিঘ্ন আর জটিলকুটিল সমস্যা–সব ভুলে আনন্দিত হয়ে উঠুন। যে-সব রঙিন স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে, বাস্তবায়িত হয়নি–নতুন করে স্মরণ করুন সেগুলোকে। আনন্দিত হয়ে উঠুন।

প্রশ্ন করবেন, তাই না? জানি কি প্রশ্ন করতে চাইছেন: কেন, অতীতের ব্যর্থতার জন্যে এতো আনন্দ করতে যাবো কেন?

কারণ আছে। আনন্দিত হওয়ার কারণ হলো, এই বই আপনাকে এমন এক ফর্মুলা দিচ্ছে যে ফর্মুলার সাহায্যে আপনি আপনার রঙিন স্বপ্নগুলোকে সত্যিই বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছেন এতোদিনে। আপনার ব্যর্থতার গ্লানি ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে সাফল্যের অনাবিল আনন্দ। কথা দিচ্ছি।

সাফল্যের পথের যাত্রী আপনি। আমার সাথে রওনা হয়েছেন। আপনার অস্তিত্ব যেমন সত্য, এই যাত্রাও তেমনি সত্য। পায়ে হাঁটা অবস্থা থেকে গাড়ি কিনে চড়ার অবস্থার দিকে যাত্রা আপনার। দুঃখ, দুশ্চিন্তা, হীনম্মন্যতা, দীনতা থেকে আনন্দ, সুখ, স্ফূর্তি এবং অঢেল ঐশ্বর্যের দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। খুশির কথা নয়?

ঐশ্বর্য এবং প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ দরকার আপনার। বেঁচে থাকার জন্যে শুধু একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোই নয়, আরাম-আয়েশের জন্যে, বিলাসিতার জন্যে সবরকম উপকরণ অর্জন করবার অধিকার আপনার আছে।

আর, একান্তভাবে দরকার মানসিক শান্তি। মানসিক শান্তি আপনাকে দেয়া কারও দয়ার দান–এরকম ভাববেন না, নিষেধ করছি আপনাকে। এই জিনিসটি পাবারও সঙ্গত অধিকার আপনার আছে।

মনকে শান্তি দিন। মনের শান্তি আপনার মধ্যে না থাকলে বিপদ। এখন থেকে সাবধান হোন, মনকে অশান্তিতে ভোগাবেন না আর। সাফল্যের পথে রওনা হতে এই জিনিসটারও দরকার, জেনে রাখুন। এটাকে বাদ দিয়ে রওনা হওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হতে চলেছে। ইতিমধ্যে দিবালোকের মতো কয়েকটি ধ্রুব সত্য প্রমাণ হয়ে গেছে। সত্যগুলো কি কি, সিরিয়ালি সাজিয়ে ফেলি, আসুন।

১) আপনি সাফল্য চান। ২) সাফল্য গন্তব্যস্থান নয়, যাত্রা বা ভ্রমণ। ৩) সাফল্য অর্জন করতে হলে আপনাকে জানতে হবে–আপনি সফল হতে পারবেন। ৪) আমি পারবো এই বিশ্বাসের সাথেই দরকার হচ্ছে আমি করবো এই দৃঢ় সংকল্পের। ৫) সংকল্প প্রাণহীন, তার দেহের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে সক্রিয় তৎপরতার দ্বারা। ৬) অঢেল প্রাচুর্য অর্জন করার সঙ্গত অধিকার আপনার আছে। ৭) মানসিক শান্তি সাফল্য অর্জনের জন্যে একটি শর্ত।

এই পরিচ্ছেদ শেষ হবার আগে, আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই। পাতা ওল্টাবার আগে, এই প্রথম পরিচ্ছেদটা প্রথম থেকে আর একবার পড়ে নিন। গোটা বইয়ের মধ্যে এই প্রথম পরিচ্ছেদই কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়বার প্রথম পরিচ্ছেদটা পড়া শেষ করে বইটা বন্ধ করে রাখুন কিছুক্ষণের জন্যে। আপনি যে আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু করেছেন এটা অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। কল্পনা করুন এমন একটা নতুন জীবনের যে জীবনের নিয়ন্ত্রক স্বয়ং আপনি, কল্পনা করুন এমন একটা সুষ্ঠু পরিবেশের যে পরিবেশের সৃষ্টি নন আপনি, বরং স্রষ্টা।

পরিকল্পনা

পরিকল্পনার অর্থ সঙ্কল্পিত কাজটিকে বাস্তবায়িত করার উপায় বা প্রণালী উদ্ভাবন।

সঙ্কল্পিত কাজটিকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে উপায় আবিষ্কার করতেই হবে আপনাকে। এর জন্যে মাথা ঘামানোর দরকার পড়ে। আপনাকে চিন্তা করে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

ভয়ের কিছুই নেই, কারণ চিন্তা করে উপায় উদ্ভাবনের ব্যাপারটা মোটেই কঠিন নয়। এর জন্যে প্রতিভাবান বা অসাধারণ বুদ্ধিমান না হলেও চলবে।

কাজ একটি, কিন্তু সেটিকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে অনেকগুলো উপায়ের দরকার। ধরুন, পিকনিকে যাবেন। আপনার বন্ধু-বান্ধবদের কারো মাথায় এলো, সে-ই প্রকাশ করলো ইচ্ছের কথাটা। আপনারা সবাই রাজি হলেন যেতে।

এবার পরিকল্পনা রচনার পালা।

কাজ একটি–পিকনিক। পরিকল্পনা করতে হলে এই কাজটিকে বেশ কয়েকভাগে ভাগ করে নিতে হবে। এবং প্রত্যেকটি ভাগকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে আলাদা আলাদা উপায় আবিষ্কার করে নিতে হবে।

প্রথমেই যে প্রশ্নটি দেখা দেবে সেটি হলো, কোথায় যাবেন? এ ব্যাপারে মত বিরোধ দেখা দিতে পারে। কেউ বলবে চন্দ্রায় যাবো, কেউ বলবে জয়দেবপুরের নাম বা সুদূর কক্সবাজারের নাম। ধরুন, আপনারা দশজন বন্ধু যাবেন, ছয়জনই এর আগে চন্দ্রায় পিকনিক করে এসেছেন। একই জায়গায় দু'বার যেতে চায় না সাধারণত কেউ।

তর্ক-বিতর্ক চলবে আপনাদের মধ্যে। আরো উল্লেখযোগ্য জায়গার নামে প্রস্তাব উঠবে। কিন্তু দেখা গেল প্রশ্নটার সমাধান হচ্ছে না। উপায়?

আবিষ্কার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা গেল, রাজবাড়িতে যাবার কথা বলছে সাতজন। বাকি তিনজন রাজি নয়, কারণ রাজবাড়িতে আগে গেছে তারা। এই তিনজনের মধ্যে হয়তো আপনিও আছেন। সমস্যাটার সমাধানকল্পে, অধিকাংশ বন্ধু যখন রাজবাড়িতেই যেতে চাইছে, আপনিও সম্মতি দিলেন। বাকি রইলো দু'জন। এদেরকে বোঝানো দরকার। সবাই মিলে চেষ্টা করলেন। দু'জনই হয়তো, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত রাজি হলো রাজবাড়ি যেতে। কিংবা, যদি রাজি না হয়, অগত্যা ওদের দু'জনকে বাদ দিয়েই আপনারা সিদ্ধান্ত নিলেন, রাজবাড়িতেই যাবেন পিকনিক করতে।

এক নম্বর সমস্যার সমাধান হলো। এরপর দু'নম্বর সমস্যা। কবে যাবেন?

এ ব্যাপারেও মতবিরোধ দেখা দেবে। কেউ বলবে আগামী মাসের এক তারিখে শুক্রবার, ছুটির দিন, ওই দিনই চলো। কিন্তু দু'জন মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলো, আগামী মাসের এক তারিখে জরুরী কাজ আছে, কোনোমতেই যেতে পারবো না। ব্যবসা করে এমন দুই বন্ধু হয়তো বলবে, তাহলে দু'তারিখে, শনিবার দিন চলো। পাঁচজন হয়তো সাথে সাথে প্রতিবাদ জানাবে, কারণ, তারা চাকরি করে, শনিবার দিন অফিস কামাই করা অসম্ভব।

প্রশ্নটাকে নিয়ে সমস্যার উদ্ভব হবে। সমস্যাটার সমাধান করতে হলে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। আগামী মাসের আট তারিখ, শুক্রবার। সকলের ছুটির দিন। কেউ হয়তো এই দিনটির কথা বললো। ওই দিনে হয়তো আপনার জন্যে ঢাকার বাইরে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কারণ, ওই আট তারিখে, আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে, স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাবেন। সাত তারিখে বেতন পাবেন, আট তারিখে সিনেমা দেখতে নিয়ে যাবেন–কথা দিয়েছেন

স্ত্রীকে। প্রায় বছর খানেক স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা দেখেননি। রীতিমতো ঝগড়া-ঝাঁটি, মান-অভিমানের পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অমুক তারিখে নিয়ে যাবেনই। এই অবস্থায় সিনেমা না দেখিয়ে আপনার উপায়ই নেই, প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে।

ওদিকে, আপনি ছাড়া, আর সবাই ওই আট তারিখে পিকনিকে যাওয়ার ব্যাপারে একমত। এখন উপায়? চিন্তা করতে হবে আপনাকে। উপায় বের করতে হবে।

সিনেমাও দেখাতে হবে, পিকনিকেও যেতে হবে। একই দিনে দুটো কাজ করা সম্ভব নয়। চিন্তা করতে গিয়ে আপনি দেখবেন, সমস্যাটার সমাধান একটা নয়, বেশ কয়েকটি আছে। যেমন, এক–নির্দিষ্ট তারিখের আগেই স্ত্রীকে সিনেমা দেখিয়ে দেয়া। দুই–স্ত্রীকে সমস্যাটার কথা বলা, তাকেও পিকনিকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়া। তিন–স্ত্রীকে ঘুষ দেয়া (সিনেমা দেখাতে খরচ হবে ত্রিশ টাকার মতো, তাকে পঞ্চাশ বা একশো টাকার কিছু দেবার লোভ দেখান, বলুন, পরে সিনেমা দেখাবো)। চার–মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে তাকে ক্ষান্ত করা। আপনি বলতে পারেন, আট তারিখে বসের বাড়িতে যেতে হবে, পদোন্নতির ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্যে (তবে, মিথ্যে অজুহাত না দেখানোই ভালো)। অর্থাৎ কোনো না কোনো ভাবে আপনার ব্যক্তিগত সমস্যাটার সমাধান আপনি করে নিলেন। মিটে গেল পিকনিকে যাবার দু'নম্বর সমস্যা।

এইভাবে, এক এক করে প্রতিটি বাধা এবং সমস্যা খতিয়ে দেখে উপায় উদ্ভাবনের মাধ্যমে সব কিছু স্থির করতে হবে আপনাকে। একের পর এক প্রশ্ন উঠবে। প্রত্যেকটিরই উত্তর বের করে নিতে হবে। কখন রওনা হবেন, কখন ফিরবেন, খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে, কতো টাকা করে চাঁদা ধরা হবে, তৈজসপত্র সাথে নেবেন কি কি, কার কাছে কি তৈজসপত্র আছে,–ইত্যাদি আরো অনেক ব্যাপারে আলোচনা করে প্রত্যেকটি ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাদেরকে। অর্থাৎ পিকনিকে যাবার ইচ্ছাটাকে একটা পরিকল্পনার

মধ্যে বন্দী করতে হবে। আপনাদের পরিকল্পনা যতোটা নিখুঁত হবে পিকনিকটাও সেই পরিমাণ নির্ঝঞ্ঝাট, আনন্দ মুখর ও উপভোগ্য হবে। এই-ই নিয়ম।

এই নিয়ম সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কোনো কাজে সাফল্য চান? পরিকল্পনা রচনা করুন।

আপনি সাফল্য চান। সাফল্যের পথে রওনা হতে চান। কি করতে হবে আপনাকে তা এখন আবার নতুন করে বলে দিতে হবে না নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, একটি সুন্দর, নিখুঁত পরিকল্পনা রচনা করা দরকার এখন।

কোথায় কোথায় যাবেন? সাফল্যের পথে যাত্রা শুরু করার আগে এই প্রশ্ন উঠছে, তাই না? কোথায় কোথায় যাবেন অর্থাৎ কি কি চান আপনি?

সাফল্যের পথে যাত্রা, খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা। মুখে মুখে বা মনে মনে এর পরিকল্পনা করা উচিত হবে না। কাগজ কলম নিন।

কাগজ কলম নিয়েছেন? বেশ। একটু সবুর করুন, প্রয়োজনীয় দু'চার কথা বলে নেই আগে। কি কি চান তা ঠিক করবেন আপনি, ঠিক করে জিনিসগুলোর নাম লিখবেন কাগজে। অর্থাৎ একটা তালিকা তৈরি করবেন।

আপনার প্রয়োজন এবং আপনার ইচ্ছা বা কামনা–এ অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কি কি চান আপনি তা আপনাকে নিখুঁত, পরিষ্কার এবং বিশদভাবে জানতে হবে। এবং যা যা চান, গুরুত্ব অনুসারে, এক এক করে সাজাতে হবে।

কিন্তু তারও আগে, যা যা চান তা ঠিক করার আগে, আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি কি কি চান না।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করছি।

ধরুন, আপনি একটি পুরানো বিল্ডিংকে ভেঙে নবরূপ দিতে চান। প্রথম পদক্ষেপটা কি হবে আপনার? একজন আর্কিটেক্টকে ডাকা, তাই না? বেশ, আর্কিটেক্ট এলেন। তাঁর প্রথম পদক্ষেপটা কি হবে?

বিল্ডিংটিকে ঠিক কি রূপে রূপান্তরিত করতে চান তিনি তা সবচেয়ে আগে স্থির করতে হবে তাঁকে। নবরূপ দানের জন্যে তিনি একটি পরিকল্পনা রচনা করবেন অর্থাৎ তিনি একটি নকশা তৈরি করবেন এবং নকশাটিকে বাস্তবে রূপ দেবার সূচনা-স্বরূপ তিনি স্থির করবেন বিল্ডিংটা থেকে কি কি জিনিস সরিয়ে ফেলতে হবে, কোন্ কোন্ অংশ আংশিক বা সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলতে হবে। অন্য কথায়, গড়ে তোলার আগে তাকে ভাঙার কাজে হাত দিতে হবে।

নতুন করে জীবনটাকে গড়ে তুলতে হলে আর্কিটেক্ট ভদ্রলোকের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে আপনাকেও।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদরা প্রত্যক্ষদর্শনে বিশ্বাসী। আপনার পরিকল্পনাটা কাগজে লিখে নিন, প্রয়োজনে কাগজের ভাঁজ খুলে লিখিত পরিকল্পনা পরীক্ষা করুন বারবার এবং প্রয়োজন মতো সংশোধন করুন–এই প্রচলিত নিয়ম পালন করার পরামর্শ তো তাঁরা দিচ্ছেনই, তাঁরা আরও বলছেন, তুমি যা চাও অর্থাৎ তোমার অবজেকটিভ বা কাম্যবস্তু যে জিনিসটি সেটির ছবি তোমাকে দেখতেই হবে।

ছবি দেখতেই হবে–কিভাবে? পরে বলছি। তার আগে আপনার জানতে হবে কিভাবে তৈরি করবেন আপনার অবজেকটিভের তালিকা।

আপনার অবজেকটিভের সংখ্যা জানতে হবে আপনাকে। কি কি চান, লিখে ফেলতে হবে এক এক করে, সাধারণ একটা তালিকা তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা। এটাকে আপনি কাম্যবস্তুর তালিকা বা অবজেকটিভ চার্ট বলতে পারেন। চার্টটাকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করে নেবো। এই চার্টের তালিকা হয়তো আপনার নিজস্ব চাহিদার তালিকার সাথে মিলবে না। আপনার প্রয়োজন এবং মনের ইচ্ছাগুলো হতে পারে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। সেক্ষেত্রে, তালিকার নমুনাটা বুঝে নিয়ে আপনি নিজেই নিজের জন্যে একটি আলাদা চার্ট তৈরি করে নেবেন, আপনার নিজস্ব প্রয়োজন এবং মনের ইচ্ছাগুলো অনুযায়ী।

আসুন, শিখে নিন। কাগজ নিন দু'শিট ফুলস্কেপ। কলম নিন।

নিয়েছেন কাগজ-কলম?

বেশ। প্রথম কাগজটার উপরে লিখুন, বেশ বড় বড় অক্ষরে–বস্তু। এবার স্থির করুন অর্থাৎ চিন্তা করে নির্ধারণ করুন কি কি বস্তু প্রয়োজন আপনার। এক এক করে, সিরিয়াল নম্বর দিয়ে লিখে ফেলুন আপনার প্রতিটি প্রয়োজন। ধরুন, আপনার এক নম্বর প্রয়োজন (বস্তুগত উপকরণ)–একটি নতুন বাড়ি। কাগজে লিখুন, ১) একটি নতুন বাড়ি। এর নিচে লিখুন, ২) একটি নতুন ব্যবসা। এইভাবে নম্বর দিয়ে লিখতে থাকুন এক এক করে প্রত্যেকটি প্রয়োজনের নাম–৩) নতুন গাড়ি। ৪) টেলিভিশন। ৫) ইলেকট্রিক ফ্যান। ৬) ফ্রিজ। ৭) স্টীল আলমারি। ৮) দামী ক্যামেরা। ৯) ড্রেসিং টেবিল। ১০) থ্রী-ইন-ওয়ান। ১১) রেডিওগ্রাম। ১২) গহনা। ১৩) দামী ঘড়ি। ১৪) কার্পেট। ১৫) এয়ারকুলার। ১৬) পোশাক-পরিচ্ছদ। ১৭) সোফা। ১৮) অ্যান্টিকস। ১৯) বন্দুক। ২০) দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ২১) প্রজেক্টর। ২২) মুভিক্যামেরা। ইত্যাদি।

বস্তুগত উপকরণের শেষ নেই। সুতরাং তালিকাটা দীর্ঘ হবে না ক্ষুদ্র হবে তা সম্পূর্ণ আপনার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করছে। ইচ্ছা করলে তালিকা আপনি যতো খুশি বড় করতে পারেন, কিংবা প্রথমে ছোটখাট একটা তালিকা তৈরি করতে পারেন। পরে, যথাসময়ে, আরো প্রয়োজন যোগ করবেন। দীর্ঘ হয়ে উঠবে ক্রমশ তালিকাটা। যথাসময়ে বলতে আমি বলতে চাইছি, ছোটো তালিকার সবগুলো প্রয়োজন মিটে যাবার পর। এক এক করে সবগুলো প্রয়োজন মেটাবেন আপনি। তারপর আরো প্রয়োজন যোগ করবেন তালিকায়। যোগ করার মতো চাহিদার অভাব কোনোদিনই হবে না আপনার। যতোদিন বেঁচে থাকবেন, এটা-সেটার প্রয়োজন লেগেই থাকবে। সেই প্রয়োজনের জিনিসগুলো অর্জন করে নিতে হবে আপনাকে।

আপনার প্রয়োজনের (বস্তুগত উপকরণের) তালিকার প্রথম দু'চারটির মধ্যে কিন্তু থাকতে হবে–অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার ব্যবস্থা।

এবার দু'নম্বর কাগজটি নিন।

এটির উপর বড় বড় অক্ষরে লিখুন–বিষয়।

কি কি বিষয়ে পারদর্শী হতে চান আপনি, ভেবে বের করুন। তারপর সেগুলো সিরিয়াল নম্বর দিয়ে এক এক করে লিখে ফেলুন।

ধরুন, আপনি হতে চান ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী। লিখুন।

১) ভালো স্বাস্থ্য চাই। ২) ওজন কমিয়ে একহারা হতে চাই। ৩) স্মরণশক্তি বাড়াতে চাই। ৪) অভ্যাসের নিয়ন্ত্রক হতে চাই। ৫) মনোনিবেশ করার ক্ষমতার অধিকারী হতে চাই। ৬) সুখী হতে চাই। ৭) আত্মবিশ্বাসী হতে চাই। ৮) স্মার্ট হতে চাই। ৯) দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া শিখতে চাই। ১০) আরো জ্ঞান অর্জন করতে চাই। ১১) ধূমপান ছাড়তে চাই। ১২) পরচর্চা ত্যাগ করতে চাই। ১৩) সকলের প্রশংসা পেতে চাই। ১৪) নেতৃত্ব লাভ করতে চাই। ১৫) সম্মানজনক পেশা পেতে চাই। ১৬) পারিবারিক মর্যাদা বাড়াতে চাই। ১৭) মানসিক শান্তি পেতে চাই। ১৮) বিদেশে ভ্রমণে যেতে চাই। ১৯) সৃষ্টিধর্মী কাজে পারদর্শী হতে চাই। ২০) সুন্দর বাচন ভঙ্গির অধিকারী হতে চাই অর্থাৎ সুন্দরভাবে কথা বলা শিখতে চাই। ২১) আত্মীয়-স্বজনের প্রিয়পাত্র হতে চাই। ২২) ছেলে-মেয়েদেরকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। ২৩) সৎ হতে চাই। ২৪) সমাজের সেবা করতে চাই। ২৫) বন্ধুত্ব অর্জন করতে চাই। ২৬) সম্মানী মানুষদের সংস্পর্শে আসতে চাই। ২৭) চাকরিতে উন্নতি করতে চাই। ২৮) আধুনিক জীবন-যাপন পদ্ধতি শিখতে চাই। ইত্যাদি।

এক লাফে গাছে চড়তে গেলে যেমন পপাত ধরণীতল হবার আশঙ্কা আছে তেমনি আপনার অবজেকটিভের তালিকার সবগুলো বস্তু এবং বিষয় যদি একবারে একসাথে অর্জন করতে চান তাহলে বিপদ ঘটবার সমূহ সম্ভাবনা। তাছাড়া কোন দৈব-বলে সব যদি একবারে পেয়েও যান, কদিন পরেই বাসি হয়ে যাবে সব, নতুন বিষয় ও বস্তু খুঁজতে হবে পাগলের মতো। কাজেই একবারে একটি বস্তু বা বিষয়কে বেছে নিন, সেটিকে অর্জন করার চেষ্টা করুন।

একটার পর একটা কাম্যবস্তু অর্জন করবেন, জীবনটা হয়ে উঠবে আনন্দ মুখর, বৈচিত্র্যময়।

তালিকা তো তৈরি করেছেন। এবার প্রত্যক্ষদর্শনের পালা। আপনার অবজেকটিভকে কি করে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করবেন তাও জানতে হবে আপনার। নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, সেগুলো আপনাকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতে হবে, কাজে লাগাতে হবে একটা অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক শক্তিকে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের নিয়ম শেখার আগে আরো কিছু কথা জেনে রাখুন, উপকারে আসবে।

সাফল্যের পথে যাত্রী আপনি। সাথে কি কি নেবেন, ঠিক করতে হবে না? যোদ্ধা যায় যুদ্ধ করতে, সাথে নেয় সে অস্ত্র-শস্ত্র। আরো কিছু জিনিস সাথে নিতে হয় তাকে। বলুন তো কি সেই জিনিস?

বেশ কয়েকটি জিনিস সাথে নিতে হয় তাকে। যেমন–এক, দেশ প্রেম। দুই, সাহস। তিন, ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা। চার, নিয়মানুবর্তিতা। পাঁচ, আদেশ পালনের দৃঢ় সংকল্প, ইত্যাদি।

আপনাকে কিন্তু বিশেষ কিছুই সাথে নিতে হবে না। বস্তুগত উপকরণ–দরকার নেই। যা পরে আছেন, কাপড়চোপড় ছাড়া, আর কিছু নিতে হবে না সঙ্গে। কিন্তু মনের ভাণ্ডারে কিছু জিনিসপত্র নিতে হবে, যা হবে আপনার সাফল্যের ভ্রমণে পাথেয়-স্বরূপ। কি কি নিতে হবে, আসুন, ঠিক করে ফেলা যাক।

আমি পারবো–এই বিশ্বাস

আমি পারবো এই বিশ্বাস আপনার না থাকলে আপনি কোনো কাজে হাতই দেবেন না, তাই না? সুতরাং আগে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি পারবেন। এটাই প্রথম কাজ।

প্রশ্ন করতে পারেন, আমি পারবো এই বিশ্বাস কিভাবে নিজের মধ্যে আনা যায়?

নিজের মধ্যে এই বিশ্বাসটি আমদানী করা খুবই সহজ কাজ। যা

আপনি সত্যি করতে চান তা করতে সবরকম উপায়ই ব্যবহার করবেন, সম্ভাব্য সব কিছু করতে রাজি আছেন–মাত্র এই চিন্তাটুকুই আপনার মধ্যে "আমি পারবো" এই বিশ্বাস এনে দেবে।

সম্ভাব্য সবকিছুই আপনি পারবেন, এটা নির্ভেজাল সত্যি কথা। আপনি মানুষ, মানুষের দ্বারা যা সম্ভব, আপনার দ্বারাও তা সম্ভব। লিঙ্কনের কথা ধরুন। অতি সাধারণ লোক ছিলেন তিনি। কিভাবে পরবর্তী জীবনে তিনি হতে পেরেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট? আমি হতে পারবো–এই বিশ্বাস তাঁর মধ্যে ছিল বলেই তো।

আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, মনীষী, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবনী ঘেঁটে দেখুন, এঁদের অধিকাংশই ছিলেন আমার-আপনার মতোই সাধারণ মানুষ। পারবো–এই মনোবল এবং বিশ্বাসই তাঁদেরকে বড় করেছে। আপনিও মনে করুন–পারবো। তাহলেই পারবেন। যত বড় হতে চাইবেন, ঠিক তত বড়ই হতে পারবেন।

কোনো কাজকে কঠিন মনে করা উচিত নয়। কারণ, কোনো কাজই আসলে কঠিন নয়। দশতলা একটা দালান দেখে কি মনে হয়? মনে হয় না কি, এইরকম একটা বিল্ডিং তৈরি করা কঠিন কাজ? কিন্তু আসলে কি তাই? না, তা নয়। সম্পূর্ণ কাজটিকে এক নজরে দেখে কঠিন বলে মনে হলেও আসলে তা সত্যি কঠিন নয়। একরাতে একজন লোক বিল্ডিংটাকে তৈরি করেনি। করেছে বহু লোকজন মিলে, একটু একটু করে, অনেকদিন ধরে। বিল্ডিংটা একটা বড় কাজ। সেটাকে ছোটো ছোটো কাজে ভাগ করে নিয়ে সবাই মিলে প্রতিটি ভাগকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। ক্ষুদ্র কাজগুলোর একত্রিত রূপ হলো বিল্ডিংটা। যারা এটা তৈরি করার জন্যে খেটেছে তাদের কাছে মোটেই কঠিন বলে মনে হয়নি। তারা নিয়ম পালন করে মনের আনন্দে যার যার কাজ করে গেছে মাত্র।

আপনাকেও নিয়ম পালন করে কাজ করতে হবে। কাজ করতে যদি আপত্তি না থাকে, তাহলেই যা করতে চান তা করতে পারবেন।

আমি করবো–এই দৃঢ় সংকল্প

আমি করবো এই দৃঢ় সংকল্প নিজের মধ্যে আনা যায় কিভাবে?

এক, সুখী একজন মানুষ বলে মনে করুন নিজেকে।

দুই, উদ্দেশ্যের প্রতি উৎসাহী থাকুন।

তিন, বাধাবিঘ্নগুলোকে খুঁটিয়ে দেখে নিন, যেগুলোকে আপনার টপকাতে হবে।

চার, সক্রিয় তৎপরতামূলক পরিকল্পনা রচনা করুন।

পাঁচ, জড়তা কাটিয়ে উঠুন। কাজ ফেলে রাখার বদভ্যাস ত্যাগ করুন।

ছয়, কাজে হাত দেবার জন্যে তৈরি হোন এবং তৈরি হয়েই হাত দিন।

সাত, একনাগাড়ে এগিয়ে যান।

সুখী বলে মনে করুন নিজেকে

বলবেন, হুঁহ্ মনে করলেই কি সুখী হওয়া যায়?

আসলে, যায়। কিন্তু তার আগে সুখী হওয়ার সুফল সম্পর্কে বলতে হয় দু'চার কথা। অসুখী হওয়ার কুফলও আলোচ্য এ প্রসঙ্গে। আপনি অসুখী হলে মন তো বটেই, শরীরও আপনার দুর্বল হবে, নড়তে চড়তে চাইবে না। অসুখী লোক না-বাচক মতামত পোষণ করে, নৈরাশ্যব্যঞ্জক মানসিকতার অধিকারী হয়। ছোটোখাটো কাজ তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় জটিল, নীরস, পাহাড়প্রমাণ।

উৎসাহ তৈরি করে, মনে আগ্রহ জন্মায়, প্রেরণা ও উদ্যম যোগায় এই সুখবোধই। আপনি যখন সুখী, শরীরটাও চমৎকার থাকে। এমনকি কাজের সময়গুলোও অত্যন্ত দ্রুত এবং আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটে যায়।

সুতরাং, সুখী হোন। কিভাবে? আপনি বলবেন, জীবনে যা যা চেয়েছিলাম তার কিছুই তো পেলাম না। সুখী নই তবু নিজেকে সুখী বলে মনে করতে হবে?

সুখী নন, কে বললো? আসলে আপনি সুখী, মুশকিল হলো ব্যাপারটা গোপন রয়েছে আপনার কাছে। আপনি সুখী, কিন্তু তা আপনি জানেন না। জীবনে যা যা চেয়েছিলেন, পাননি এতোদিন–কিন্তু এবার তো পাবেন! 'আমি পারবো' এই বিশ্বাস আছে আপনার, 'আমি করবো' এই সংকল্পও গড়ে তুলছেন নিজের মধ্যে–জীবনের সব শখ-সাধই তো পূরণ হতে যাচ্ছে আপনার, সকল কাম্যবস্তুই তো পাচ্ছেন, বলা যায় পেয়ে গেছেন–এরপরও কি কোনো যুক্তি আছে আপনার নিজেকে সুখী বলে মনে না করার?

যাদের মধ্যে 'আমি পারবো' এই বিশ্বাস এবং 'আমি করবো' এই সংকল্প নেই তারা কাজে হাত দেবার পূর্বেই ব্যর্থতাকে মেনে নেয় এবং তাদের ব্যর্থতার কারণস্বরূপ অসংখ্য অজুহাত দেখিয়ে বেড়ায়। লক্ষ করুন, অজুহাত শব্দটি ব্যবহার করছি আমি, যুক্তি শব্দটি নয়। সে আপনাকে অজুহাত হিসেবে দেখাতে পারে–শিক্ষার অভাব। এটা একটা যুক্তি নয়। বর্তমান যুগের রেডিও-টেলিভিশন, অসংখ্য লাইব্রেরী, প্রকাশনালয়, নাইট স্কুল ইত্যাদির বদৌলতে যে-কেউ যে-কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জন করে নিতে পারে।

সময়ের অভাবটাকে কেউ কেউ ব্যর্থতার যুক্তি হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করে। এটাও একটা অজুহাত মাত্র। গঠনমূলক কাজে মানুষ যতোটা না সময় খাটায় তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সময় অপব্যয় করে সে নিষ্ফল, উৎপাদনহীন কাজে।

সময়টাকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে ভাগ করে নেয়াটা জরুরী। সঠিকভাবে সময়ের বাজেট না করলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র আধ ঘণ্টার কাজ বাজারে যাওয়ার সময়ও আপনি খুঁজে পাবেন না।

কিছু মানুষ আছে যারা দায়সারা গোছের কাজ করতে অভ্যস্ত। এরা হাফ-আন্তরিক ভাবে কাজ করে। ফলে, সময় ঠিকই বয়ে যায় তার নিজস্ব গতিতে, কাজটা যেমন সুচারু হওয়া উচিত ছিল তেমন হয় না। কাজটা মানগত দিক দিয়ে নিকৃষ্ট বিধায় মানসিক সন্তুষ্টির অভাব

ঘটে, এবং সময়ের পরবর্তী ভাগগুলো উপভোগ্য হয় না বা গঠনমূলক কাজের উপযুক্ত থাকে না।

অভিজ্ঞতার অভাব–এটাও একটা অজুহাত, যুক্তি নয়। কেউই অভিজ্ঞ হয়ে জন্মায় না। অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। কাজে হাত দিলেই অভিজ্ঞতা হয়। অভিজ্ঞতা নেই মনে করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে কোনোদিনই অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারবেন না।

বাংলাদেশে প্রখ্যাত এক ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট জজ কোর্টের চত্বরে ঘুরে ঘুরে কেটলীতে গরম চা বিক্রি করতেন, কাপ প্রতি এক আনা, পাকিস্তান আমলের প্রথম যুগে। সেই ব্যক্তি এখন নিজের বিশাল কারখানায় তৈরি ছাতা বিদেশে রফতানী করেন। অ্যাকাডেমিক ডিগ্রী ছিল না ভদ্রলোকের, ছিল না ছাতা তৈরি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতাও।

পুরানো ঢাকার বসুবাজার নামক পাড়ায় রাস্তার উপর দশ ইঞ্চি একখানা ইঁটের উপর বসে সিঙ্গাড়া, পিঁয়াজি, ফুলুরি বিক্রি করতেন হোসেন আলী, মাত্র ছয় বছর আগে। সাতাত্তরে তিনি একজন হোটেল ম্যানেজার, মাসে বেতন পাচ্ছেন আড়াই হাজার টাকা।

'আমি পারি' এই বিশ্বাস এবং সচেতনতা নিজের মধ্যে আমদানী করা সহজ হবে আপনার পক্ষে যদি আপনি এই সত্যটা জানেন: সফল এবং ব্যর্থ মানুষের মধ্যে পার্থক্য হলো, একজন জানে, বিশ্বাস করে এবং ভাবে আমার দ্বারা সম্ভব; আর একজন জানে, ভাবে, বিশ্বাস করে, আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

সুখী হবার সবচেয়ে বড় ও সহজ এবং একমাত্র উপায় হলো, নিজেকে সুখী বলে মনে করা। মনে করে দেখুন, নিজেকে সুখী মানুষ বলে স্বীকার করে নিতে বিশেষ দেরি হবে না। সত্যিই সুখ আসবে আপনার অন্তরে।

উদ্দেশ্যের প্রতি উৎসাহী থাকুন

লক্ষ্যের প্রতি আগ্রহ এবং উৎসাহের কমতি হলে সে-লক্ষ্যে পৌঁছানো

কক্ষনো সম্ভব নয়। এমনকি 'আমি পারবো' এই বিশ্বাস আপনার মধ্যে থাকলেও, দক্ষতা অর্জনে, যোগ্যতা অর্জনে বা সিদ্ধিলাভে আপনি সফল হতে পারবেন না–অর্জনে যদি উৎসাহ না থাকে।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী-পুরোহিত ডক্টর নরম্যান ভিনসেন্ট পীলের মতে, ভালোবাসা বা প্রেম হলো উৎসাহের সবচেয়ে বড় উৎসস্থল। একজন মানুষ তার স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালোবাসে, সে তার স্ত্রীকে সুখী করার জন্যে, খুশি করার জন্যে বিস্ময়কর সব বস্তুগত, আদর্শগত উপকরণ সংগ্রহে উৎসাহ বোধে সর্বদা আপ্লুত থাকবে।
খ্যাতি, দক্ষতা, যোগ্যতা, মর্যাদা, সৌন্দর্য এগুলোর প্রতি ভালোবাসা থাকলে অঢেল উৎসাহ আসে এগোবার কাজে।

আপনি নেতৃত্ব চান, চান সাধারণ মানুষের চেয়ে উপরে উঠতে, চান সবাই আপনাকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখুক, শ্রদ্ধা করুক–এই ইচ্ছা, এই চাওয়া আপনাকে উৎসাহ যোগাতে পারে, এবং এই উৎসাহ আপনাকে এগিয়ে যাবার কাজে সক্রিয়, তৎপর করে তুলবে।

বাধাবিঘ্নগুলোকে খুঁটিয়ে দেখে নিন

আপনার এবং আপনার যে-কোনো কাম্যবস্তুর মাঝখানে মাথা তুলে শত্রুর মতো দাঁড়িয়ে আছে কিছু বাধা-বিঘ্ন। এই বাধাবিঘ্নগুলো না থাকলে যা ইচ্ছা তাই তুলে নিলেই হতো, কামনা করামাত্র হাতের মুঠোয় পেয়ে যেতেন আপনি, শুধু নেয়ার অপেক্ষা।

চিনে-জেনে নিন আপনার এবং আপনার কাম্যবস্তুর মাঝখানে কি কি বাধা রয়েছে।

বাধাবিঘ্নগুলো চেনা হলে আপনার পক্ষে সহজ হবে সেগুলোকে টপকাবার জন্যে কি কি বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা নেবেন তা ঠিক করা। পরিকল্পনা করে এগোবেন আপনি। একটা করে বাধাকে বেছে নেবেন, আগে থেকে ঠিক করা ব্যবস্থা অনুযায়ী বাধাটাকে টপকাবার কাজে হাত দেবেন। এই ধরনের তৎপরতামূলক কাজে প্রচুর মজা পাওয়া

যায়। একটা করে বাধা টপকাবেন এবং নিজেকেই নিজের শিক্ষক বলে গর্ব অনুভব করবেন, যা অন্য কোনো ভাবে অনুভব করার সুযোগ নেই আপনার।

জড়তা কাটিয়ে উঠুন

জড়তার মানে হতে পারে কুঁড়েমি। উৎসাহের অভাবেও জড়তা আসে। অকারণ চক্ষুলজ্জা, মিথ্যে সম্মানবোধ, অহেতুক ভয় ইত্যাদির ফলে জড়তার শিকার হতে পারেন আপনি। জড়তা মানুষকে বন্দী করে রাখে তার হাতের মুঠোয়, এতোটুকু নড়তে চড়তে দেয় না। বন্দী মানুষ কি কাজের কাজ কিছু করতে পারে? পারে না। জড়তায় আক্রান্ত মানুষ মৃত মানুষের সমতুল্য। জড়তা মানে অচলতা, এবং অচলতা উন্নতি, প্রগতি ও সাফল্যের পরম শত্রু।

এক ব্যক্তির কথা ধরুন, চাকরি জীবনে সে হয়তো জড়তাগ্রস্ত, অফিসে উপস্থিত হয় নামেমাত্র, কাজে মন নেই, চেয়ারে বসে ঘুমে ঢোলে। এই ব্যক্তিই বেলা দুটোর পর নিউজপ্রিন্টের বাজারে দালালী করে, তখন তাকে দেখলে চেনাই মুশকিল। গোটা বাংলাবাজার এবং নয়াবাজার এলাকাটা সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমন পঞ্চাশবার চক্কর মারবে, কাজ ছাড়া ফালতু এক সেকেণ্ড ব্যয় করবে না। এরকম দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেয়া যায়। কেন হয় এরকম? কাজে আনন্দ থাকলে সে কাজ করতে ভালো লাগে, এটাই কারণ। যে কাজে আনন্দ আছে সে কাজ করতে জড়তার বাধা আসে না।

জড়তার কবল থেকে মুক্ত থাকতে হলে আপনাকেও কাজের ভিতর আনন্দ পেতে হবে। জেনে রাখুন, আপনার কাজগুলোয় আনন্দের অভাব ঘটতেই পারে না। কারণ, আপনার কাজের দ্বারা আপনি মুক্তি, নিরাপত্তা, সচ্ছলতা, প্রশংসা, ক্ষমতা, মর্যাদা এবং সুখ অর্জন করতে যাচ্ছেন। যে-সব কাজ করবেন সেগুলো আপনাকে দেবে প্রাচুর্য। শুধু যতোটুকু না হলেই নয়, ততোটুকু না-অঢেল, প্রচুর। সুতরাং আপনার কাজের ভিতর আনন্দ থাকবেই।

কাজে হাত দেবার জন্যে তৈরি হোন

কখনো কি অকস্মাৎ অচল হয়ে যাওয়া গাড়িকে ঠেলে চালু করার চেষ্টা করেছেন? করে থাকলে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, গাড়িটাকে চালু করার জন্যে আপনার দেহের সর্বশক্তি ব্যয় করতে হয়েছিল। তাই-ই হয়। কিন্তু গাড়িটা একবার চালু হয়ে গেলে সামান্য শক্তিতেই সেটাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়। মানুষের বেলাতেও সেইরকম–একটা কাজ শুরু করতে উইল-পাওয়ার দরকার হয়, কিন্তু কাজটায় একবার হাত দেয়া হলে তা শেষ করার জন্যে তেমন কোন বেগ পেতে হয় না।

একনাগাড়ে এগিয়ে যান

একজন শল্য চিকিৎসকের কথা ধরুন। অপারেশন থিয়েটারে রোগী শুয়ে আছে। চিকিৎসক অপারেশনের জন্যে এলেন। রোগীর পেট কেটে বের করতে হবে একটা পাথর। চিকিৎসক পেট কাটলেন কিন্তু পাথরটা বের না করে তিনি ত্যাগ করলেন অপারেশন থিয়েটার। কয়েক ঘণ্টা বা ক'দিন পর কাজটা সম্পন্ন করবেন তিনি। এরকম ভাবা যায়? যায় না। অপারেশন যখন শুরু হয়েছে, সেটাকে শেষ করতেই হবে, ফেলে রাখা চলবে না। সেইরকম যে-কোনো কাজেই হাত দিন, কাজটা শেষ না করে ক্ষান্ত হবেন না। শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম শেষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকুন, শেষ পর্যন্ত পৌঁছুন।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল?

বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছেন আপনি। এরপর তৃতীয় পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা শেষ করে বইটা বন্ধ করে যদি আলমারিতে তুলে রাখেন, সত্যি খুব খুশি হবো। দু'দিন পর আবার বের করবেন বইটা, পড়বেন তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই দু'দিন বইটা না পড়ে বর্তমান যুগের প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদদের পরামর্শ অনুযায়ী আপনি পরিকল্পনাভিত্তিক প্রত্যক্ষদর্শনে মনোনিবেশ করুন। আপনার তৈরি অবজেকটিভ তালিকাটা আর একবার খতিয়ে

দেখে নিন। তারপর মানসপটে দেখতে থাকুন কাম্যবস্তুগুলো আপনার অধিকারে এসে গেছে। সবচেয়ে বেশি কাম্য যে বস্তু–কি সেটা? ঠিক, নতুন একটা, চমৎকার একটা বাড়ি দরকার আপনার। বেশ। এবার প্রত্যক্ষদর্শনের জন্যে কাজে হাত দিন। কোন্ কোন্ এলাকা পছন্দ আপনার ঠিক করুন। বাড়িটা যে এলাকায় চান সেই এলাকাটা দেখে আসুন আজই। সেই এলাকায় নিজের পছন্দ মতো কোনো বাড়ি আছে কিনা, বেছে বের করুন। থাকলে ভালো, না থাকলে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী একটা বাড়ির ছবি আঁকিয়ে নিন কোন আর্কিটেক্টকে দিয়ে, কিংবা পত্র-পত্রিকায় ছাপা কোনো বাড়ির ছবি যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, সেটা কেটে নিন কাঁচি দিয়ে। ঠিক যে-ধরনের বাড়ি আপনি চান হুবহু সেই ধরনের একটা বাড়ির ছবি সংগ্রহ করতে হবে আপনাকে। ছবিটা দেখবেন এবং মনকে অসংখ্যবার বলবেন, এই বাড়িটা আমার। আশা বা ইচ্ছাভিত্তিক কিছু ভাববেন না। আপনি বিশ্বাস করবেন ওইরকম একটা বাড়ির মালিক হয়ে গেছেন আপনি ইতিমধ্যেই। বাড়িটা অর্জন করেছেন আপনি, শুধু দখল পাওয়াটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার মাত্র।

নতুন, ঝকঝকে, হাল ফ্যাশনের একটা প্রাইভেট কার পেলে খুব মজা হতো, না? চান একটা ওইরকম গাড়ি? ঠিক আছে। বলে দিচ্ছি কি করতে হবে। দেরি না করে গাড়ির ডিলার বা এজেন্টদের শো-রুমে যান একবার। আজ গেলেই সবচেয়ে ভালো হয়। সেখানে অনেকরকম গাড়ি দেখবেন, কিন্তু পছন্দ করবেন যেটা চান সেটা। পছন্দ করার পর থেকে ভাবতে শুরু করুন, ওই বিশেষ কোম্পানির বিশেষ গাড়িটি আপনারই। মনে মনে কল্পনা করুন, দেখবেন ভালো লাগবে, গাড়িটা নিয়ে বন্ধু-বান্ধব বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমেত বেড়াতে যাচ্ছেন রাঙ্গামাটি বা কক্সবাজার। ও হ্যাঁ, একটা ছবি সংগ্রহ করতে হবে গাড়িটিরও।

ফার্নিচার, কাপড়, স্বর্ণ এবং অন্যান্য দোকানে যান, জিনিসপত্র পছন্দ করুন ঘুরে ঘুরে। এতোদিন যে-সব জিনিসের স্বপ্ন দেখেছেন সেই সব জিনিস দোকানে দোকানে ঢুকে চাক্ষুষ করুন, প্রত্যক্ষ করুন,

মনের পর্দায় গেঁথে ফেলুন প্রত্যেকটি জিনিসের ছবি–এবং ভাবুন এসব জিনিস আপনার আয়ত্তে না আসার কোনো কারণ নেই, এসব জিনিস আপনারই জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, এগুলো আপনারই।

কাম্যবস্তু অর্জন করা কি কি কারণে সম্ভব নয় তা ভাবতে যাবেন না। অধিকাংশ মানুষ সর্বদা অজুহাত দেখায় এই–এই কারণে সে সাফল্য লাভ করতে পারবে না। তারা কক্ষনো সফল হবার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। অর্থাৎ পরিকল্পনায় হাত দেবার আগেই পরিকল্পনাটাকে ব্যর্থ বলে মেনে নেয় তারা। তাদের দ্বারা সাফল্য আশা করা বৃথা। কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ প্রমাণ হয়ই, সেক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা করা দরকার। বিকল্প পদ্ধতি থাকেই, গ্রহণ করলেই হয়। ব্যর্থতাকে মেনে নেয়া মানে নিজের কাছে অপরাধ করা।

আপনি অভিযোগ তুলে বলতে পারেন, যে জিনিস এখনো আমি পাইনি সে জিনিস পেয়েছি বলে মনে করে আনন্দে মাতোয়ারা হবো কেন? এ তো গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের মতো ব্যাপার। ব্যাপারটা আসলে তাই-ই, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের মতোই। তেল দিন গোঁফে, গাছের কাঁঠালটা আপনার জন্যেই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। ওটা আপনারই। গোঁফে তেল না দিলে কাঁঠাল পাবার আশা নেই আপনার।

আমার স্নেহভাজন শেখর চৌধুরী, (বলা বাহুল্যঃ ছদ্মনাম) পেশাদার লেখক, বহু বছরের সম্পর্ক তার সাথে, ব্যক্তিগত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই সে নৈরাশ্যব্যঞ্জক সংলাপ উচ্চারণ করতো। শুধু লেখা বিক্রি করে সংসার ধর্ম পালন করছে ও। এটা একটা কঠিন, প্রায়-অসম্ভব কাজ এদেশে। গড়পড়তা মাসিক যা আয় তাতে দিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু অভাব রয়েছে আর্থিক নিরাপত্তাবোধের, সঞ্চয়ের কোঠা শূন্য থাকছে, বীমা করার সঙ্গতি নেই–ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষদের যা যা সমস্যা, ওরও সেই সমস্যা। ওটা আসলে

খুবই ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি। ও বা ওর পরিবারের কেউ যদি কঠিন কোনো রোগে পড়ে, চোখে অন্ধকার দেখবে গোটা পরিবারটা। তার উপর রয়েছে একটু ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যের অভাব, এবং সেইহেতু বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের কারণে ও লেখার কাজে ততোটা আন্তরিক হতে পারছে না যতোটা হওয়া উচিত, পরিবারের প্রতি ততোটা দায়িত্বশীল হতে পারছে না যতোটা হওয়া উচিত, সমাজ এবং সভ্যতার জন্যে অবদান রাখতে পারছে না ক্ষমতানুযায়ী যতোটুকু রাখা উচিত।

ওর সমস্যাটা নিয়ে একদিন আলোচনা করলাম আমরা। দেখলাম, ওর ভয়ঙ্কর অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে ওর। আরো আবিষ্কার করলাম, এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি তাও জানে ও। তার মানে, 'আমি পারি' এই সচেতনতা আছে ওর। নেইটা তাহলে কি?

'আমি করবো'–এই সংকল্পের অভাব। দেখিয়ে দিলাম ওর ত্রুটিটা। আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলাম, কিভাবে এই ত্রুটি সংশোধন করা যায়।

স্থির হলো, অতিরিক্ত আয়ের একটা উপায় বের করতে হবে। অতিরিক্ত আয়–কি ভাবে সম্ভব? আরো বেশি লিখলে কি আরো বেশি টাকা আসবে? এমনিতেই ও যথেষ্ট বেশি লিখতে পারে, যা লেখে তা-ই ছাপার জন্যে পাবলিশার পাওয়া যায় না। তাছাড়া আরো বেশি লিখলে লেখার মান খাটো হয়ে যাবে। শুধু লেখা কেন, অনুন্নত মানের কোনো কিছুই বাজারে বিকায় না।

তাহলে?

ব্যবসা করার পরামর্শ দিলাম ওকে। সাথে সাথে কয়েকটা সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়ালো, সামনে এগোতে দেবে না। ব্যবসা মানেই পুঁজি। পুঁজি তো নেই। উপায়?

উপায় বের করার আগে ওকে স্থির করতে বললাম, কি ব্যবসা করতে চায়।

ও বললো, বইয়ের ব্যবসাটাই ওর কাছে ওর রুচি অনুযায়ী ভদ্র ব্যবসা। ছোটোখাটো একটা বইয়ের দোকান করতে পুঁজিও লাগবে কম। পরিচিত পাবলিশারদের কাছ থেকে ধারে বই তুলতে পারবে দোকানে। দোকানে বসে লেখার কাজও চালাতে পারবে।

আলোচনা এইটুকুই। ও, হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি, আলোচনা শেষে সেলফ-ইমপ্রুভমেন্ট সম্পর্কিত কয়েকটি বই দিলাম ওকে পড়তে।

মাত্র পনেরোদিন পর ও এলো। বললো, দোকান পেয়েছি। কিছু টাকা দিন। জিজ্ঞেস করলাম কতো? বললো, দুশো দিলেই চলবে। অবাক কাণ্ড, দুশো টাকায় দোকান হয় কিভাবে? প্রশ্ন করতে বললো, দোকানের জন্যে অ্যাডভান্স দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা। বেন সুইট ল্যাণ্ডের 'আই উইল' বইটির পরামর্শ অনুযায়ী বন্ধু, আত্মীয় এবং শুভানুধ্যায়ীদের একটা তালিকা তৈরি করেছে ও। একজনের উপর চাপ সৃষ্টি না করে, টাকা ধার চাইবে ও মোট ত্রিশ জনের কাছে। দুশো করে চাইবে, সকলের কাছ থেকে পেলে হবে ছয় হাজার টাকা। দোকান নেয়া হয় তাহলে।

এরপর মাত্র চারদিন পর ফিরে এলো ও। বললো, সকলের কাছে যাবার দরকার পড়েনি, মাত্র চারজনের কাছে গিয়েই পেয়েছি চার হাজার টাকা। চেয়েছিলাম দুশো করেই কিন্তু আমার পরিকল্পনা শুনে চারজনই দিয়েছে এক হাজার টাকা করে।

দোকানটা এককোণায় পড়ে গেছে। খুব একটা ভালো বেচাকেনা হবার কথা নয় ওখানে। কিন্তু ওর উদ্যম, পরিশ্রম এবং বিক্রি বাড়াবার নিত্য নতুন কৌশল বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাচ্ছে। আশাতীত বেচাকেনা করছে ও।

এটা একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শেখরের মধ্যে সব ছিলো, ছিলো না শুধু 'আমি করবো' এই সংকল্প। এই সংকল্পের অভাবটাই ওকে ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল।

সংকল্পবদ্ধ হয় ও এবং সেই সাথে রচনা করে একটা নিখুঁত

পরিকল্পনা। যার ফল, একটি চালু বইয়ের দোকান, একটি লাভজনক ব্যবসা।

ওর মতো সফল হবেন আপনিও, যদি ওর পদ্ধতিটা গ্রহণ করেন। ভ্রমণের পরিকল্পনাটা প্রচুর খেটে তৈরি করুন, আপনাকে আটকায় এমন কেউ জন্মায়নি এখনও পৃথিবীতে।

গোপনসূত্র বা প্রত্যক্ষদর্শন

প্রত্যক্ষদর্শন এখন একটি প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক কৌশল হিসেবে স্বীকৃত। পৃথিবী বিখ্যাত আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদরা প্রত্যক্ষদর্শনের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, যা পেতে চাও তার ছবি দেখতে হবে, মনে গেঁথে নিতে হবে তার চেহারা।

প্রত্যক্ষদর্শন নতুন কোনো ব্যাপারও নয়। প্রাচীনকালের মানুষও কাম্যবস্তুর ছবি আঁকতো গুহার দেয়ালে, কল্পনা করতো হত্যা করেছে সে বাইসনটাকে। কোনো কিশোর হয়তো স্বপ্ন দেখতো সে বড় হয়ে যোদ্ধা হবে। রণক্ষেত্রে যোদ্ধার পোশাক পরে, অস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখতে পেতো সে নিজেকে, মানসপটে। রাজপুত্র স্বপ্ন দেখতো অমুক রাজার মেয়ে, রাজকুমারী চপলাকে সে বিয়ে করবে। সে রাজকুমারীকে চাক্ষুষ করতো মনের পর্দায়। আজকের মানুষও কাম্যবস্তুর স্বপ্ন দেখে। মনের পর্দায় দেখার সাথে যোগ হয়েছে খাতার পাতায় দেখা।

বইটা বন্ধ করে বাড়ি থেকে বেরোন, দোকান থেকে কিনে আনুন একটা বাইণ্ডিং করা খাতা। আর যদি ওরকম একটা খাতা হাতের কাছে থকে, তাহলে তো কথাই নেই। এখুনি বসে পড়ুন কাজে। গোপন সূত্র দিচ্ছি, লিখে নিন। যাদুর মতো কাজ দেবে এই সূত্র।

এই খাতাটাকে আপনি রোমাঞ্চকর এক ছবির খাতায় পরিণত করবেন। কাম্যবস্তুর ছবি সংগ্রহ করুন এক এক করে, প্রত্যেকটি ছবি খাতার পৃষ্ঠায় এক এক করে আলাদা আলাদা ভাবে আঠা দিয়ে সেঁটে দিন। নতুন, সুন্দর একটি বাড়ি চাই আপনার। কোনো ডিজাইনারকে

দিয়ে মনের মতো একটা বাড়ির নকশা আঁকিয়ে নিন। সেই নকশাটা খাতার পৃষ্ঠায় লাগান। বাড়িটার সামনে, পিছনে, পাশে যদি সুন্দর বাগান, লেক, খেলার মাঠ ইত্যাদি থাকে, সেগুলোও যেন ডিজাইনের মধ্যে স্থান পায়।

নতুন একটা গাড়ি, হোক না আপনার দু'নম্বর কাম্যবস্তু। যে মডেলের গাড়ি চান, সংগ্রহ করুন তার একটা ছবি, তারপর খাতার দু'নম্বর পৃষ্ঠায় আঠা দিয়ে সাঁটুন সেই ছবি।

একটা বিখ্যাত কোম্পানির টেলিভিশন সেট যদি হয় আপনার তিন নম্বর কাম্যবস্তু, যোগাড় করুন সেই কোম্পানির টিভি সেটের একটা ছবি, খাতার তিন নম্বর পৃষ্ঠায় আটকান এটাও। আর কি? আর যা যা দরকার সংগ্রহ করুন সবগুলোর একটা করে ছবি এবং খাতায় লাগান আঠা দিয়ে।

বিদেশ ভ্রমণ করতে চান, যেতে চান লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক বা কায়রোতে? বেশ তো, সংগ্রহ করুন যে-দেশে যেতে চান সে-দেশের রাজধানীর একটা বিখ্যাত এলাকার ফটো। সেটাকেও খাতার পৃষ্ঠায় স্থান দিন।

প্রশ্ন করবেন, যে জিনিস আমি চাই সেই জিনিসের ছবি সংগ্রহ করলেই কি তা আমি পাবো?

এর উত্তরে বলবো, হ্যাঁ, পাবেন। আপনি যদি কোনো জিনিস অন্তর দিয়ে চান সে জিনিস কিভাবে যেন পেয়ে যান। এই রকমটি সব মানুষের বেলাতেই ঘটে। চাইলেই হয়, চাওয়ার মধ্যে আন্তরিকতা ও গভীরতা থাকলে, তা পাবেনই।

খাতায় ছবি সাঁটলেই কিন্তু কাজ হচ্ছে না। প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনার প্রথম কাজ হবে ড্রয়ার থেকে বা তোশকের নিচ থেকে খাতাটা টেনে বের করে পাতা ওল্টানো। প্রত্যেকটি ছবি, নকশা বা ফটোর দিকে তাকাবেন আপনি। একটি ছবির দিকে কমপক্ষে দেড় মিনিট, ঊর্ধ্বে পাঁচ মিনিট করে তাকিয়ে থাকতে হবে। যতো বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকবেন ততোই ভালো ফল লাভের আশা।

ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকার সময় কক্ষনো ভাববেন না যে ছবির এই জিনিসটি পাওয়ার ইচ্ছে আছে আমার বা পেলে ভালো হয় কিংবা ওটা পেলে আমার আশা পূরণ হয়। ছবিটির দিকে দৃষ্টি রেখে আপনি ভাববেন, ওটা আমার। ওটার একচ্ছত্র অধিপতি হতে যাচ্ছি আমি। জিনিসটাকে আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

এ কাজ আমার দ্বারা হবে না, জিনিসটা পাবার আশা নেই, আশা করে লাভ কি, জানিই তো কপাল খারাপ, সে যোগ্যতা আমার নেই, পারবো না, করবো না, যেমনটি চাই তেমনটি ঘটবে না–আপনি কদাচ না-সূচক বাক্য উচ্চারণ করবেন না। নেতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনার জন্যে হারাম।

ইতিবাচক মনোভাবের সুফল হলো, আপনার অবচেতন মনকে আগে-ভাগেই মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন আপনি, অমুক কাজটা করবো বলে ভেবেছি, সুযোগ এলে খবর দিয়ো আমাকে, সাহায্য কোরো।

অবচেতন মনকে গুরুত্ব দেয়া দরকার আপনার। আপনি সচেতনভাবে যা করার পরিকল্পনা করেন আপনার অবচেতন মন আপনাকে সেই কাজ সম্পন্ন করার কাজে পরম বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারে।

সুতরাং, ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হোন। সুফল হাতে হাতে ফলবে।

একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক অলকেশ বিহারীর কথা ধরুন। মাত্র বছর কয়েক আগে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে 'চার আনা' 'চার আনা', 'চার আনা', 'যে-কোনো বই চার আনা'-গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতো। তখনও দেখেছি ওকে, এখনও দেখছি। ফুটপাথের হকার ছিলো, তখনও বলতো, হবে। কি হবে? বলতো গাড়ি হবে, বাড়ি হবে, পত্রিকা হবে, পাবলিকেশন হবে, সুখ হবে, সম্মান হবে, টাকা হবে, পেপটিক আলসার ভালো হবে।

হবে, হবেই হবে–এই ছিলো অলকেশের মূলমন্ত্র। নেতিবাচক

বক্তব্য তার মুখ থেকে কেউ কখনো শোনেনি। ফলাফল?

মাসিক একটি পত্রিকার মালিক সে এখন। বাংলাবাজারে বইয়ের দোকান আছে। শতাধিক বইয়ের প্রকাশক। মাসিক আয় দশ হাজার টাকার উপর। চারটে বড় বড় সুসজ্জিত কামরা নিয়ে তার অফিস। নতুন আরো একটি পত্রিকা বের করার জন্যে ডিক্লারেশন চেয়েছে, পেলো বলে। প্রচুর জমি কিনেছে। বাড়িতে টিভি, থ্রী-ইন-ওয়ান, রেডিও, ফ্রিজ, দামী আসবাবপত্র, মুভি ক্যামেরা, প্রজেক্টর–ভালো থাকতে হলে যা যা দরকার প্রায় সব উপকরণই সংগ্রহ করেছে সে ইতিমধ্যে। শুনেছি, শিগগিরই গাড়ি কিনবে একটা।

প্রায় নিরক্ষর যে, বাল্য এবং কৈশোর কাল দুর্যোগপূর্ণ যার, ক্লেদাক্ত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যার বয়স বেড়েছে–তার এরকম সাফল্যের কারণ কি?

ইতিবাচক মনোভাব। হবে, হবেই হবে–এই ছোট্ট অথচ যাদুকরী শব্দ তিনটিই অলকেশের সাফল্যের একমাত্র গোপনসূত্র।

সাফল্যের পথে ভ্রমণে বেরুবার আগে আপনার কাছে দুটি অনুরোধ করবো আমি। এক, অতীতের স্বপ্নভঙ্গের ঘটনা ভুলে যান। অতীতের ব্যর্থতার জন্যে মনে দুঃখ পুষে রাখা দরকার নেই। কারণ, আপনার জীবনের সব আশা এবং সব রঙিন স্বপ্নই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আরো পরিষ্কার করে বললে বলতে হয়, এক এক করে আপনার কাম্যবস্তু পেতে শুরু করেছেন আপনি।

হ্যাঁ, পেতে শুরু করেছেন, কোনো সন্দেহ নেই এতে। পাবার জন্যে কি কি করতে হবে, জেনে ফেলেছেন আপনি, তাই না? যা যা করতে হবে, করতে শুরু করেছেন। কি দাঁড়ালো? পেতে যাচ্ছেন আপনি আপনার কাম্য-বস্তু, কোনো বাধা নেই আর, ঠিক?

কেউ যদি আশপাশে না থাকে, আমার কথায় সায় দিন, বলুন, বেশ জোরে বলুন–ঠিক।

দুই, তৃতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হবে এরপর। কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদে যাবার আগে পিছনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে

নিন। প্রত্যেকটি প্যারাগ্রাফ পড়ুন। প্রতিটি বাক্যের অর্থ সঠিকভাবে আপনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন কিনা পরীক্ষা করুন। কোনো বক্তব্য যদি অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য বলে মনে হয়, বারবার পড়ুন সেই অংশটা। যতোক্ষণ না সম্পূর্ণ, পরিষ্কার অর্থটা বুঝতে পারেন ততোক্ষণ পড়ুন, বুঝুন। কারণ সাফল্যের চাবিকাঠি রয়েছে প্রথম দুটো পরিচ্ছেদেই। এরপর সমস্তই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

সফল হতে শুরু করেছি

আমেরিকার কন্সালটিং সাইকোলজিস্ট এবং লেখক বেন সুইটল্যাণ্ড সমুদ্রপথে ভ্রমণ করছিলেন। জাহাজের ডেকে পূর্ব পরিচিত একজন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিকের সাথে তাঁর দেখা। এই ভদ্রলোকের বিস্ময়কর সাফল্য লাভের ইতিহাস জানতেন বেন সুইটল্যাণ্ড। ভদ্রলোকের লক্ষ লক্ষ বিঘা সম্পত্তি আছে, ইউরোপের কোটিপতিদের একজন তিনি।

গল্পে মেতে গেলেন দুজনে। এক সুযোগে ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন বেন সুইটল্যাণ্ড, 'তোমার জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা কি? প্রথম মিলিয়ন ডলার ব্যাঙ্কে জমা হলো যখন–সেটাই কি তোমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক ঘটনা?'

কোটিপতি দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দার্শনিক ভঙ্গিতে বললেন, 'না, বেন, প্রচুর টাকার মালিক হবার পর সে ঘটনা ঘটেনি, ঘটনাটা ঘটেছিল প্রথম যখন আমি টাকা রোজগার করতে শুরু করি।'

সাধারণ এক মানুষ ছিলেন এই ভদ্রলোক। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে কায়ক্লেশে দিন কাটাতেন। নিজের বাড়ি গাড়ি কিছুই ছিলো না।

অতিরিক্ত রোজগার করার ইচ্ছা থাকলেও, মনের মতো কোনো কাজ পাচ্ছিলেন না। একসময় বাজারে এলো নতুন একটা আইটেম। জিনিসটা আর কিছু নয়, নতুন একটা গায়ে মাখার সাবান। বাজারে নামকরা টয়লেট সোপ প্রচুর ছিলো। একচেটিয়া বাজার সেগুলোর। নতুন এই সাবানের বাজার পাবার কোনো কারণই দেখতে পেলো না কেউ। কিন্তু ওই ভদ্রলোক নিজে ওই নতুন সাবান ব্যবহার করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, এটি অন্য নাম-করা যে-কোনো ভালো সাবানের চেয়ে কোনো অংশে নিম্নমানের নয়, বরং এর সুগন্ধটা আরো ভালো এবং দামও অপেক্ষাকৃত কম।

সরাসরি নতুন সাবান কোম্পানির অফিসে গিয়ে হাজির হলেন তিনি। আলোচনা, দর কষাকষি করে শহরে বিক্রি করার জন্যে নতুন সাবানটার এজেন্সী নিয়ে নিলেন। প্রথম প্রথম ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। নতুন জিনিস, কেউ সহজে কিনতে চায় না। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিলো, এই সাবানকে প্রত্যাখ্যান করা শহরবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। দু'দিন আগে বা পরে এর কদর বুঝবে সবাই।

ঘটলও তাই। নতুন সাবানটা মাসকয়েকের মধ্যে একচেটিয়া ভাবে বাজার দখল করে ফেললো। ভদ্রলোক পয়সা কামাতে শুরু করলেন। এই যে অতিরিক্ত পয়সা কামাবার ঘটনা, এই ঘটনাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক, রোমাঞ্চকর ঘটনা। প্রথম পর্যায়ের এই অতিরিক্ত টাকা দিয়ে তিনি কেনেন স্ত্রীর জন্যে পোশাক, ছেলে-মেয়েদের জন্যে খেলনা, বাড়ির জন্যে টিভি, ফার্নিচার, গাড়ি–এসবই রোমাঞ্চকর ঘটনা তাঁর জীবনের। অর্থাৎ পরিবর্তনের সূচনাটাই আনন্দদায়ক, রোমাঞ্চকর।

আপনার জীবনেও পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে, আপনি সাফল্যের যাত্রা পথে ভ্রমণে বেরুচ্ছেন, এই ঘটনাটা আপনার জীবনে রোমাঞ্চকর ও আনন্দদায়ক হয়ে থাকবে। বিশ্বাস করুন, সাফল্য লাভ করতে শুরু করেছেন আপনি। এই ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলুন নিজের ভিতর।

আগেই বলেছি, শতকরা পঁচানব্বই জন লোক নেতিবাচক মনোভাবের অধিকারী। জন্মসূত্রে এই মনোভাবের অধিকারী নয় তারা। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পরও এই মনোভাব তাদের মনে শিকড় গাড়েনি। তারা যখন ছোটো ছিলো তখনই তাদের অবচেতন মনে এই নেতিবাচক মনোভাবের বীজ বপন করে দেয়া হয়েছে।

ছোটো বাচ্চা যখন নবাগত আগন্তুকের সামনে যেতে ইতস্তত করে, গুরুজনরা চোখ-কান বুজে মন্তব্য করেন, 'ও বড্ড ভীরু!' এভাবেই বাচ্চার অবচেতন মনে ভীরুতার বিষ প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো। যে বিষ সাধারণতঃ বাচ্চার বাবা হয়ে যাবার পরও, অর্থাৎ, আজীবন থাকবে তার সাথে।

আমরা গরীব মানুষ, টাকা রোজগার করা সহজ কাজ নয়, সকলের ভাগ্যে সব হয় না—এই ধরনের নেতিবাচক বাক্য শিশুর মনে স্থায়ী ভাবে দাগ কাটে, সে নেতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হয়ে ওঠে।

কাম্যবস্তু অর্জন করার জন্যে হয়তো একটা পরিকল্পনা তৈরি করলেন। কিন্তু মনটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকছে—কানে কে যেন ফিসফিস করে বলছে, 'চেষ্টা করে লাভ কি, ব্যর্থ তো হবেই।'

কে বলছে কথাটা আপনাকে? আপনারই অবচেতন মন। আপনি যখন ছোটো ছিলেন, আপনাকে কেউ না কেউ এই ধরনের সাবধানবাণী শুনিয়েছিল নিশ্চয়ই। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন কথাটা। কিন্তু আপনার অবচেতন মন ভোলেনি। সে যা শোনে তা ভোলে না। তাকে যা শেখানো হয় সে তাই শেখায় পরবর্তীকালে।

সাফল্যের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, মন থেকে নেতিবাচক মনোভাব সমূলে উৎপাটন করতে হবে। ইতিবাচক, 'হ্যাঁ-সূচক, আশাব্যঞ্জক এবং গঠনমূলক চিন্তাভাবনা ও মনোভাবের অধিকারী হতে হবে। আপনি যদি ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হতে পারেন, শতকরা পাঁচজন মানুষের যে দুর্লভ গুণ আছে আপনিও সেই গুণের অধিকারী হবেন। যে-কোনো কাম্যবস্তু অর্জন করাটা তখন আপনার

কাছে অসম্ভব বলে মনে হবে না। যা ইচ্ছা তাই চাইতে পারেন এবং পেতে পারেন। যখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবেন। আপনি সুখ অনুভব করবেন–সামগ্রিক এবং সাচ্চা অর্থে আপনি হবেন সুখী মানুষদের একজন।

নিজেকে আপনি ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী বলে ভাবতে শুরু করুন। তা ভাবতে পারলে চরম প্রয়োজনীয় এবং কঠিনতম কাজটি শেষ হলো, ধরে নিন।

আপনি সাফল্য লাভ করতে চান, ভালো কথা। কিন্তু একটি শর্ত আছে। মানবেন তো? যদি মানেন, সফল আপনি হবেনই। শর্তটা হলো, আপনাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে–'আমি সফল হতে শুরু করেছি। সাফল্য আসতে শুরু করেছে আমার জীবনে।'

ব্যাঙ্কে টাকা জমার জন্যে অপেক্ষা করবার দরকার নেই আপনার, নতুন বাড়ি-গাড়ি কিনে তারপর নিজেকে সফল মনে করবার দরকার নেই। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক, কেন আপনি নিজেকে এখুনি সফল একজন বলে মেনে নেবেন, বিশ্বাস করবেন।

ধরুন, আপনি একজন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, টাকা পয়সা তেমন কিছুই নেই আপনার। হঠাৎ করে রেডক্রসের লটারির প্রথম পুরস্কারটি পেয়ে গেলেন। দু'লাখ টাকার প্রাইজ! পেয়ে তো আপনি আনন্দে আটখানা হবেন, নিজেকে একজন ধনী মানুষ বলে ভাবতে শুরু করবেন, তাই না? কিন্তু, চিন্তা করে দেখুন তো, কি এমন জিনিস পেয়েছেন আপনি যা খবরের কাগজে প্রকাশিত লটারির নাম্বারের সাথে আপনার কেনা টিকেটের নাম্বার মিলে যাবার আগে ছিলো না? নাম্বারটা শুধু মিলেছে, এর বেশি কিছুই তো ঘটেনি। টাকা তো পাননি এখনও? তাহলে এতো লাফালাফি কিসের, কিসের এতো আনন্দ?

নাম্বারটা মিলেছে মাত্র। আপনাকে রেডক্রস কর্তৃপক্ষের কাছে আগামী এক মাসের মধ্যে টিকেটসহ লিখিত আবেদন জানাতে হবে টাকা পাবার জন্যে। কর্তৃপক্ষ আপনার আবেদনপত্র পড়বেন, ডেকে পাঠাবেন আপনাকে চিঠির মারফত, দেখতে চাইবেন তাঁরা আপনার

টিকেটটা, পরীক্ষা করবেন টিকেটটা নকল কিনা, যাচাই করে দেখবেন টিকেট বিক্রি করার অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক বা পোস্ট-অফিস থেকে টিকেটটা আপনি কিনেছিলেন কিনা–এতোসব কর্মকাণ্ড সমাপ্ত হবার পর তাঁরা একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন–সেই অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হবে আপনি প্রাইজ পেয়েছেন এবং আপনাকে তাঁরা একটি দু'লাখ টাকার চেক দেবেন।

চেক পেলেও সেটি তখুনি আপনি ভাঙাতে পারছেন না। প্রথমে নিজের নামে একটা একাউন্ট খুলতে হবে আপনাকে। সেই একাউন্টে জমা দিতে হবে চেকটি। চেক বই পেতে আরো ক'দিন সময় লাগতে পারে। চেক বই পেলে আপনি টাকা তুলতে পারবেন। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার মধ্যে তেমন কিছু আনন্দ নেই। টাকা তুলে কি করবেন? টাকা তো খাবার জিনিস নয়। টাকা থাকা না থাকা তো সমানই, যদি না তা আপনি পছন্দসই জিনিস কিনে উপভোগ করেন।

লটারির টিকেটের নাম্বার মিলে যাওয়াতে আপনি আনন্দে লাফাতে শুরু করে দিচ্ছেন, কিন্তু টাকা পেতে, টাকা পেয়ে খরচ করে উপভোগ করতে অনেক সময়ের দরকার–সে কথা ভেবে তো আপনার আনন্দে ভাটা পড়ছে না। টাকা না পেলেও নাম্বার মিলেছে জানতে পেরেই আপনি নিজেকে একজন ধনী মানুষ বলে মনে করছেন।

বেন সুইটল্যাণ্ড আপনাকে বলছেন, নিজেকে তুমি সফল একজন বলে মনে করো, কারণ সফল হবার মনোভাব এসেছে তোমার এবং এই মনোভাবই সফলতা আনতে যাচ্ছে।

আপনি সাফল্য লাভ করেছেন। কারণ, সাফল্য লাভ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন আপনি। দুই লক্ষ টাকার চেক পাবার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ এটা। চেকটা আপনাকে দিচ্ছে মাত্র দুই লক্ষ টাকা, তাছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সাফল্যলাভ করার মনোভাব আপনাকে দেবে গাড়ি, বাড়ি, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ, সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য, উপভোগ্য জীবন। তাহলে কেন সুখী হবেন না এখুনি?

আপনি কি অবসর সময়ে হাতের কাছে কাগজ কলম থাকলে আঁক

কাটেন? বইয়ের ব্যাক কাভারে, খবরের কাগজের গায়ে, লেটার প্যাডে খামোকা দাগ কাটেন? এই বদভ্যাসটাকে কাজে লাগাবার উপায় বের করেছেন নেপোলিয়ান হীল। তিনি বলছেন, অবসর সময়ে হাতের কাছে কাগজ কলম থাকলে অর্থহীন দাগ কাটার বদলে কিংবা বারবার সর্বত্র নিজের নাম লেখার বদলে লিখুন, 'সুখ' এই শব্দটি। বিভিন্ন ভঙ্গিতে লিখুন শব্দটি। ছোটো করে লিখুন, বড় করে লিখুন, গোটা গোটা অক্ষরে লিখুন, মোটা করে লিখুন, দ্রুত লিখুন, ধীরে ধীরে লিখুন। ইংরেজিতে লিখুন, বাংলায় লিখুন যতোরকম ভাবে সম্ভব সুযোগ পেলেই লিখুন–'সুখ'। কিংবা 'সাফল্য'। কিংবা 'সমৃদ্ধি'। যতোভাবে লেখা যায় ততোরকম ভাবে বারবার লিখুন–আমি সুখী, আমি সফল, আমি সমৃদ্ধ।

যে বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে চান সে বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন–এই রকম কল্পনা করবেন আপনি আমি সফল শব্দ দুটো লেখার সময়।

নিয়ম-কানুন জানিয়ে দেয়া হলো। যদি পালন করতে পারেন, সাফল্যলাভ করবেন আপনি, কোনো সন্দেহ নেই।

সুখ

সাফল্য চান আপনি। কেন চান?

সাফল্য সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা আছে কিনা তা কখনও খতিয়ে ভেবে দেখেছেন কি? অনেকে মনে করে সাফল্য মানে টাকা, যার প্রচুর টাকা আছে সেই সফল। আসলে কি তাই?

টাকা থাকলেই কিন্তু সুখী হওয়া যায় না। টাকা মানেই সুখ নয়। টাকা মানেই যদি সুখ না হয় তাহলে সাফল্য মানেই টাকা হতে পারে

না। কারণ, সাফল্য সুখেরই নামান্তর। যে সুখী সেই সফল। সাফল্যলাভ মানে সুখ লাভ।

আপনি সাফল্যলাভ করতে চান–কারণ কি? কারণ একটিই, আপনি সুখী হতে চান।

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান সুখ শব্দের অর্থ দিচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, তৃপ্তি, আনন্দ, হর্ষ–সবগুলোই ভালো হালে থাকার অর্থ প্রকাশ করছে।

এমনিতেই মানুষের জীবন অত্যন্ত কষ্টকর। বেঁচে থাকাটা সত্যি কঠিন একটা ব্যাপার। কষ্ট লাঘবের জন্যে আপনাকে আহোরাত্র খাটতে হচ্ছে, প্রাণপণ চেষ্টা করতে হচ্ছে। সংখ্যা সীমাহীন কষ্টগুলোকে দূর করার নামই জীবন-যুদ্ধ।

তবু মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে চায়। যুদ্ধ করার প্রেরণা পায় কোত্থেকে? মানুষের মধ্যে রয়েছে আরাম পাবার ইচ্ছা। তৃপ্তি পাবার সাধ, আনন্দবোধ করার লোভ, হর্ষ লাভ করার শখ। অর্থাৎ, মানুষ সুখ চায়। সুখ পাবার ব্যাকুলতাই তাকে প্রেরণা যোগায়।

সুখ সবাই চায়। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় এই একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসটি?

ছুটি উপলক্ষে শহরের মানুষ বেড়াতে যায় কক্সবাজারে, রাঙ্গামাটিতে, যেখানে যার ইচ্ছা। যারা শহর ছাড়তে পারে না তারা ছুটির ক'টা দিন সিনেমা দেখে, পার্কে বেড়ায়, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে শহরের আশপাশে পিকনিক করে। কেন মানুষ এসব করে? কেন মানুষ বেড়াতে বের হয়, সিনেমা দেখে, পিকনিক করে?

একটাই উত্তর, মানুষ এসব করে শুধুমাত্র সুখ খুঁজে পাবার জন্যে। সুখের সন্ধানে মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরছে। খ্যাপা যেমন পরশপাথর খুঁজে মরে তেমনি সুখকে খুঁজছে মানুষ।

কিন্তু মুশকিল হলো, সুখ কিনতে পাওয়া যায় না, কুড়িয়েও পাওয়া যায় না। এমনকি সুখ ভাড়ায়ও পাওয়া যায় না। হাজার হাজার মাইল দূরে যান সুখের সন্ধানে, লক্ষ-কোটি মাইল দূরে যান–পাবেন না তার

সন্ধান, যদি আপনি আপনার সাথে সুখকে সাথী করে নিয়ে না যান।

সুখকে খুঁজছেন খামোকা, কারণ তাকে খোঁজার দরকারই নেই, সে তো রয়েছে আপনারই মধ্যে। সুখ আপনার মধ্যেই বসবাস করছে। তাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, সেটা আপনার দোষ। তাকে যদি দেখতে পেতে চান, দেখা দেবে সে সাথে সাথে। চাইলেই হয়।

সুখের অস্তিত্ব অনুভব করুন নিজের মধ্যে। তাকে স্বীকৃতি দিন।

আপনার সুখ মানুষ বা বস্তুর উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে মানুষ এবং বস্তুর প্রতি আপনার মনোভাবের উপর। উদাহরণস্বরূপ: একই পরিস্থিতিতে একজন হয়তো সন্তুষ্ট এবং খুশি থাকলো, অপরজন হয়তো অনুভব করলো তার বিষণ্ন হবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান রয়েছে। সহজ একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি।

মিসেস ক এবং মিসেস খ–দুটো চরিত্র। নেপথ্য থেকে অপর এক চরিত্র মিসেস ক এবং মিসেস খ-কে কিছু উপহার পাঠালো। দুটো উপহারের প্যাকেট। প্যাকেট দুটোয় হুবহু একই উপহার সামগ্রী রয়েছে।

মিসেস ক প্যাকেটটি খুলে উপহার সামগ্রী দেখলেন। উপহার পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন তিনি। উপহার সামগ্রী তাঁকে অত্যন্ত আনন্দ দান করেছে। সুখী হয়েছেন তিনি।

ওদিকে, মিসেস খ-এর উপহার মিসেস ক-এর উপহারের ডুপ্লিকেট কপি হওয়া সত্ত্বেও মুখ ভার করলেন তিনি–মোটেই পছন্দ হয়নি এই উপহার। তাঁর মনে আনন্দের উদ্রেক হলো না মোটেই। অসন্তোষ অনুভব করলেন তিনি, অসুখী বোধ করলেন।

মিসেস ক সুখী হলেন কিন্তু মিসেস খ অসুখী হলেন, একই উপহার পাওয়া সত্ত্বেও…কেন?

গ্রহণ করার মনোভাব এর জন্যে দায়ী। মিসেস ক উপহারটিকে সম্মান এবং প্রীতির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন, উপহারের সামগ্রী তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। যে উপহারটি পাঠিয়েছে সে তাঁকে ভালবাসে, স্নেহ করে–এটা প্রমাণ হয়েছে, এতেই তিনি খুশি এবং

আনন্দিত।

ঠিক উল্টোটি ঘটেছে মিসেস খ-এর বেলায়। উপহারটিকে নয়, উপহারের সামগ্রীটিকে তিনি বড় করে দেখছেন। প্যাকেট খোলার পর উপহার সামগ্রী দেখে সামগ্রীর বাজার দর কি হতে পারে, অনুমান করে মন খারাপ হয়ে গেছে তাঁর, ভেবেছেন, এতো সস্তাদরের জিনিস উপহার দেয় কেউ কাউকে!

জিনিস একই—গ্রহণ করার মনোভাবের তারতম্য হেতু একই জিনিস পেয়ে একজন সুখী, অপরজন অসুখী। সুখটা জিনিসের মধ্যে নয়—মনের মধ্যে।

মানুষ অসুখী কেন হয়?

বেশিরভাগ মানুষই নিজেকে অসুখী বলে মনে করে। হয়তো আপনিও নিজেকে সুখী বলে মনে করেন না। অথচ নিজেকে আপনার অসুখী বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।

কেন আপনি নিজেকে অসুখী বলে মনে করেন? কখনও ভেবেছেন কি?

নিজেকে অসুখী মনে করার নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কয়েকটা কারণ আছে। সেই কারণগুলো কি আপনার জানা আছে? আমার বিশ্বাস, জানা নেই আপনার।

আসুন, কেন আপনি নিজেকে অসুখী বলে মনে করেন জেনে নেয়া যাক। কারণগুলো জানা থাকলে উপকৃত হবেন, সুখী হবার রাস্তাটা পরিষ্কার করে ফেলতে পারবেন।

নিজেকে অসুখী মনে করার সাধারণ কয়েকটি কারণের কথা এখানে আমি উল্লেখ করছি। আরো অনেক কারণ আছে, সহজেই সেগুলোকে চিহ্নিত করতে পারবেন আপনি।

কারণ সমূহঃ ১) অপরাধবোধ। ২) আত্মগ্লানি। ৩) পরশ্রীকাতরতা। ৪) স্বার্থপরতা। ৫) ভীরুতা। ৬) দুশ্চিন্তা।

এই ছয়টা কারণই প্রধান। আসুন, এক এক করে প্রত্যেকটি কারণ আলোচনা করি। কারণগুলোকে বাধা বলে ধরে নিতে পারি আমরা,

সুখী হবার পথে। বাধাগুলোকে দূর করা সম্পর্কে আলোচনা করবো আমরা।

প্রথমে ধরুন, এক নম্বর বাধাটিকে: অপরাধবোধ।

আপনি জানেন, দেহের যেমন রোগ আছে তেমনি মনেরও নানারকম রোগ আছে। অপরাধবোধ একটি রোগ। মনের রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ জড়তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সচেতন বা অচেতনভাবে সে নিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে সুখ জিনিসটা তার জন্যে নয়। সব ভুলে নিজেকে কখনও যদি সে হাসতে আবিষ্কার করে, আচমকা থামিয়ে দেয় সেই হাসি, হাসি-খুশি-আনন্দ-সুখ তার জন্যে নয়, মনে পড়ে যায় কথাটা।

অপরাধবোধ মানুষকে কুরে কুরে খায়। দুর্বল, বিষণ্ন করে তোলে।

অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবার সহজ দুটি উপায় হলো, এক: যদি সম্ভব হয় যে-কারণে অপরাধবোধ জন্মেছে সেই কারণটাকে সংশোধন বা উৎপাটন করুন। দুই: যে ঘটনা ঘটে যাবার ফলে নিজেকে আপনি অপরাধী বলে মনে করছেন তা যদি সংশোধনের অতীত হয় তাহলে নিজেকে আপনি ক্ষমা করে দিন। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, পৃথিবীতে এমন মানুষ খুব কম আছে যে তার জীবনে গুরুতর ধরনের কোনো না কোনো অপরাধ করেনি। অপরাধের গুরুত্বও আবার এক একজনের কাছে এক এক রকম। ক্রোধবশত কাউকে প্রচণ্ডভাবে আহত করেও কেউ কেউ অপরাধবোধে ভোগে না, নিজেকে ক্ষমা করে দিতে পারে বলে। এই লোক নিজেকে তো ক্ষমা করেই, ভবিষ্যতে আর এ ধরনের অপরাধ না করার প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করে। আসলে প্রথমে সে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে, তারপর নিজেকে ক্ষমা করে দেয়। এই প্রতিজ্ঞাটাই ক্ষমা করতে সাহায্য করে তাকে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন: যে অপরাধ করে ফেলেছেন তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজের বিরুদ্ধে যে-সব কঠোর ব্যবস্থা নেবার কথা ভেবেছেন, সব পরিহার করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, নিজেকে ক্ষয় হতে দেবেন না, অসুখী হতে দেবেন না, ধ্বংস হতে দেবেন না এবং যে

ভুল করেছেন সেটাকে একটা শিক্ষা ধরে নিয়ে তার দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে উপকার পাবার চেষ্টা করবেন, নিজেকে গড়ে তুলবেন নিরপরাধ, সুনাগরিক, সুখী একজন মানুষ হিসেবে

সুখী হবার পথে দু'নম্বর বাধা: আত্মগ্লানি।

যে-লোক করুণার পাত্র হয়ে বেঁচে আছে সে আত্মগ্লানিতে ভুগছে, বলা যেতে পারে। অনেক সময় কেউ কেউ অকারণে নিজেকে করুণার পাত্র বলে মনে করে।

আপনি যদি আত্মগ্লানিতে ভুগতে না চান, মাথা চাড়া দিয়ে উঠুন, নিজেকে জানিয়ে দিন, আমি কারো দয়া গ্রহণ করছি না। আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পাবার দুটো উপায় রয়েছে। এক: নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা। খাটবেন, উপার্জন করবেন, কারো দয়ার দান নেবেন না। দুই: পরিশ্রমের বিনিময়ে বা বুদ্ধি খরচ করে যা পাচ্ছেন তা আপনার প্রাপ্য, কারো দয়ার দান নয় এই কথাটা বিশ্বাস করা।

সহানুভূতির কাঙাল হবেন না। এই কাঙালেপনা সুখী হবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কখনও যদি বিপদে পড়ে কারো সাহায্য গ্রহণ করার দরকার পড়ে, গ্রহণ করবেন বৈকি–কিন্তু সে জন্যে আত্মগ্লানিতে ভোগার দরকার নেই। বিপদে পড়েছেন, তাই সাহায্য নিচ্ছেন, সবাই নেয়। বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পর সেই সাহায্য ফিরিয়ে দেবেন–পরিশোধ হয়ে যাবে ঋণ। এই রকম সাহায্যকে দয়া বলে মনে করবেন না। মনে করবেন ধার নিচ্ছেন সাহায্য, পরিশোধ করে দেবেন যথাসময়ে।

তিন নম্বর বাধাটি হলো: পরশ্রীকাতরতা।

অন্যের সুখ দেখে আপনি কি ঈর্ষা বোধ করেন? যদি করেন, তাহলে আমি বলবো, বোকামি করেন। কারণ, ঈর্ষা বা হিংসা হলো খুনী, আপনার সুখকে খুন করাই এর প্রধান কাজ।

পরশ্রীকাতরতাও একটা মানসিক ব্যাধি। এই ব্যাধি যদি আপনার মধ্যে থাকে, সুখী হবার কোনো সম্ভাবনাই আপনার নেই, জেনে রাখুন। তাড়াতাড়ি রোগটার হাত থেকে মুক্ত হওয়া দরকার আপনার।

কিভাবে?

উপায়টা সহজ। উপায়টার কথা পরে বলছি। তার আগে আপনাকে জানাতে চাই কেন আপনি পরশ্রীকাতরতায় ভুগছেন।

আপনার চেয়ে ভালো হালে আছে যারা, যারা ভালো খায়-দায়, ভালো রোজগার করে, ভালো কাপড়-চোপড় পরে, গাড়ি চড়ে, বাড়ি কেনে–এরাই কি আপনার ঈর্ষার পাত্র? তা যদি হয়, তাহলে ভয়ের কিছু নেই। সহজেই ওদেরকে হিংসা না করে থাকতে পারবেন আপনি।

সাফল্য অর্জনের পথে যাত্রী আপনি, অচিরেই আপনি পেতে যাচ্ছেন আর্থিক সচ্ছলতা, গাড়ি-বাড়ি, মানসম্মান, সকলের শ্রদ্ধা, নেতৃত্ব এবং সুখ। আপনার হিংসার পাত্র যারা, তাদেরকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন আপনি সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে।

সুখী হবার পথে চার নম্বর বাধা: স্বার্থপরতা।

সবকিছু নিজের দিকে টেনে নেবার প্রবণতা আছে যার মধ্যে অথচ সে-সব জিনিস ব্যবহার বা কাজে লাগাবার প্রয়োজন নেই তার–এই রকম লোককে স্বার্থপর বলে। স্বার্থপর লোক কারো দিকে তো তাকায়ই না, মূলত সে নিজের দিকেও তাকায় না। কোনো জিনিসের বা বিষয়ের মালিক হওয়াটাই তার কাজ, সে জিনিসের ব্যবহারটা তার কাছে বড় নয়। ফলে সুখী হবার প্রচুর উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে সে কাজে লাগাবার কথা ভাবে না।

স্বার্থপরতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। স্বার্থপর লোক নিতে পারে, দিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতি শুধু দেয়। বৃক্ষ, ফুল, পাখি, নদী, মাটি, আকাশ–সবাই দাতা। প্রকৃতির দানের সীমা নেই।

প্রকৃতির নিয়মের সাথে সঙ্গতি রেখে সৃষ্টি হয়েছে বিনিময় প্রথা। তুমি কিছু দাও, বদলে তোমাকে কিছু আমি দেবো–এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। যতো বেশি দেয়া যায় ততো বেশি পাওয়া সম্ভব। কেউ যদি তার জীবনে খুব বেশি কিছু না পায়, বুঝে নিতে হবে খুব বেশি কিছু কাউকে সে দিচ্ছেও না। আপনি কি স্বার্থপর কোনো লোককে সুখী

হতে দেখেছেন? আমি দেখিনি। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করা মানে নিজের ধ্বংস ডেকে আনা। অর্থাৎ স্বার্থপর মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি শুরু হবে, তার সুখী হওয়া তো পরের কথা।

পাঁচ নম্বর বাধা: ক্ষুদ্রতা বা ভীরুতা।

ক্ষুদ্রতার সাথে স্বার্থপরতার ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক আছে। আত্মবোধ বা বিপরীত ভঙ্গিতে বললে বলতে হয় নিজের সম্পর্কে অতি-সচেতনতাই ক্ষুদ্রতার মূল কারণ। আমরা যদি বিশেষ এক পর্যায়ে উঠে শুধুমাত্র আমাদের সুখ শান্তি সমৃদ্ধির কথা ভাবার বদলে সমাজের সুখ শান্তি সমৃদ্ধির কথা ভাবতে পারি তাহলেই ক্ষুদ্রতার গণ্ডি থেকে স্বাধীনতা এবং উদারতার অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারি।

আমার জন্যে সকলে নয়, সকলের জন্যে আমি–এই রকম একটা মনোভাব গড়ে তুলুন নিজের মধ্যে। 'তুমি আমার সুখের জন্যে কি করতে পারো'–এর বদলে ভাবুন, 'তোমার সুখের জন্যে কি করতে হবে আমাকে?'

আপনাকে মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ শুধুমাত্র নিজের কথা ভাবে, নিজের স্বার্থ দেখে। এটা মনে রাখলে, মানুষের সাথে মেলামেশা করতে, ওঠাবসা করতে, মানুষের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে কোনোই অসুবিধে হবে না আপনার। মানুষ কি চায় তা আপনি জানেন। সুতরাং, যা চায় তাই করুন। তাকে সাহায্য করুন, সে খুশি হয়ে উঠবে–এবং প্রতিদানও দেবে। মানুষকে আপনি সাহায্য করবেন, কারণ, আপনি তার কাছ থেকে পাবেনও অনেক কিছু।

সুখী হবার পথে ছয় নম্বর বাধা: দুশ্চিন্তা।

দুশ্চিন্তা এবং সুখ পরস্পরের পরম শত্রু। এদের সহাবস্থান সম্ভব নয়। দুশ্চিন্তা যদি সুখের শত্রু হয়, সুখও তেমনি দুশ্চিন্তার শত্রু। আপনি সুখী–এই মনোভাব নিজের মধ্যে গড়ে তুলুন, দুশ্চিন্তা পালাতে দিশে পাবে না।

দুশ্চিন্তা সময়ের অপব্যয় ঘটায়। দুশ্চিন্তা কিছুই উৎপাদন করে না। দুশ্চিন্তা সমাধান দেবার ক্ষমতাও রাখে না। দুশ্চিন্তার ধর্ম ক্ষয় করা।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ নিজেকে ক্ষয় করে, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত সেই মানুষ সুখী হবে কিভাবে?

সুখী হবার উপায় নিজেকে সুখী মনে করা। সুখ সম্পর্কে আলোচনা করুন মানুষের সাথে। নিজেকে সুখী বলে প্রচার করুন। প্রচুর হাসুন, মানুষকে হাসান এবং আপনি সুখী একথা ভেবে গর্ব অনুভব করুন–দেখবেন সত্যি সত্যি সুখী একজন মানুষে পরিণত হয়েছেন আপনি।

যেখানেই যান, সাথে করে সুখী সুখী ভাবটা নিয়ে যান। সুখের ভঙ্গি করা সুখী হবার নামান্তর। সুখ আসলে একটা বিশেষ মনোভঙ্গি মাত্র।

যে সুখী হতে চায় সেই সুখী হতে পারে।

গভীর আগ্রহ

প্রখ্যাত প্রবন্ধকার এমারসন বলেছেন, 'গভীর আগ্রহ ব্যতীত মহৎ কোনো উদ্দেশ্য এযাবৎ সাধিত হয়নি।'

আগ্রহ শব্দটির অর্থ সবাই জানে, আপনিও জানেন। কিন্তু অনেক শব্দ আছে যার অর্থ মানুষ আবছা এবং আংশিকভাবে জানে, পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণভাবে জানে না। আগ্রহ শব্দটির অর্থ আপনি কি পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণভাবে জানেন?

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান বলছে, আগ্রহ মানে ঝোঁক, ব্যগ্রতা, ঐকান্তিক চেষ্টা বা ইচ্ছা; আসক্তি।

আসক্তি শব্দটির কথা ধরুন, এটির অর্থ গভীর অনুরাগ। আবার অনুরাগ মানে, প্রেম।

অর্থাৎ গভীর আগ্রহ মানে গভীর আসক্তি বা গভীর প্রেম। আপনি যে কাজটি করতে চান তা অনেক রকম মনোভাব নিয়েই তো করা যায়, তাই না? কাজটা আপনি প্রয়োজন বলে মনে করে করতে পারেন। করতে পারেন কর্তব্য বলে মনে করে। ঠেকায় পড়ে কাজটা করতে হচ্ছে–ভাবতে পারেন এইরকম। ভাবতে পারেন, না করলেও চলতো, তবু করছি।

উপরিউক্ত যে-কোনো একটি মনোভাব নিয়ে কাজটি করলে যে তা শেষ হবে না, তা নয়। কিন্তু কাজটি সুন্দর হবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। তাছাড়া, কাজটা শেষ হতে সময় অনেক বেশি তো লাগবেই, কাজটা করার সময় আপনি বিরক্তি বোধ করবেন, মেজাজ আপনার খিটখিটে থাকবে, নানারকম ক্ষতিকর চিন্তায় ভুগবেন, কঠিন বলে মনে হবে কাজটাকে।

কিন্তু ওই একই কাজ যদি খুশি মনে ধরেন দেখবেন সহজ মনে হবে কাজটাকে এবং দেখতে দেখতে সময় দ্রুত পেরিয়ে যাবে। খুশি মন নিয়ে কাজটা ধরলে আপনি উপকৃত হচ্ছেন।

কিন্তু আরো বেশি উপকার পাবার উপায় আছে। উপায়টা আপনার জেনে রাখা দরকার। কাজটাকে যদি আপনি গ্রহণ করেন গভীর আগ্রহের সাথে আপনি আপনার সবটুকু উৎসাহ, উদ্যম এবং শক্তি প্রয়োগ করবেন, নিজের অজান্তেই। কাজটা শুধু ভালভাবে সম্পন্নই হবে না, হবে আরো নিখুঁত, আরো সুন্দর ভাবে। আর সময়ের ব্যাপারটা? আপনি আরো সময় চাইবেন, আরো বেশি সময় নিয়ে কাজটা করার ইচ্ছা জাগবে আপনার মধ্যে।

কাজের প্রতি প্রেম থাকলে কাজটাকে আপনি কোনো মতেই খারাপভাবে সম্পন্ন হতে দিতে চাইবেন না। আপনার সন্তানকে আপনি ভালবাসেন তাই আপনি চান না সে খারাপ হয়ে যাক। তাকে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলবার জন্যে আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সেইরকম আপনার কাজকে আপনি যদি ভালবাসতে পারেন, কাজটা সম্পন্ন করার জন্যে আপনি সম্ভাব্য সবকিছু করবেন, এতে আর সন্দেহ

নেই। এবং ভালো সন্তান যেমন গর্বের বস্তু তেমনি একটি ভালোভাবে সম্পন্ন কাজও মূল্যবান বিষয়। ভালো কাজ ভালো দামে বিকোয়। অনেকগুলো ভালো কাজের সমষ্টিই হলো সাফল্য।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার মূল বক্তব্যটাকে আরো পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।

ধরুন, একজনকে এমন একটা কাজ করতে দেয়া হলো যে-ধরনের কাজ এর আগে সে কখনো করেনি। কাজটাকে সে শুধুমাত্র করণীয় বলে মনে করলে ফলাফল কি দাঁড়াবে?

কাজটিতে হাত দিতে গিয়ে সে ভয় পাবে। পারবো কি পারবো না–এই সন্দেহেও ভুগবে। ফলাফল: ব্যর্থতা।

অপর এক লোককে দেয়া হলো একই কাজের দায়িত্ব। সে কাজটিকে শুধু করণীয় বলে মনে করলো না। কাজটিকে সে গ্রহণ করলো গভীর আগ্রহের সাথে, চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। ফলাফল কি দাঁড়াবে?

আগ্রহ গভীর থাকলে ভয় দূর হয়, সন্দেহ ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। লোকটি ভয়শূন্য, সন্দেহমুক্ত মন নিয়ে কাজটায় হাত দেবে। সাফল্য লাভ করবে সে।

দৃষ্টান্তটি থেকে কি শিখলাম আমরা? গভীর আগ্রহবোধ উদ্দেশ্যের প্রতি নিবেদিত শক্তিই শুধু বৃদ্ধি করে না, সেই সাথে পথ–প্রদর্শকের ভূমিকাও পালন করে।

গভীর আগ্রহবোধ শুধু কাজ সম্পন্ন করার জন্যে দরকার তা নয়। গভীর আগ্রহ আসলে নিতান্তই উপকারী একটা বোধ, যা আপনার মধ্যে থাকলে সর্বক্ষেত্রে, সর্বকর্মে লাভবান হবেন। এই বোধ যাদুকরী ক্ষমতা রাখে।

গভীর আগ্রহকে আপনি অন্যান্য ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করবেন, বলছি এবার।

মানুষের প্রতি, তার কাজে, তার বক্তব্যে, তার সমস্যার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ দেখান। আশাতীত অনুকূল ফল পাবেন।

মুনি ঋষি, মনীষী এবং পণ্ডিতরা বলে গেছেন, মানুষকে

ভালবাসো। কেন বলেছেন তাঁরা সবাই এই কথাটা?

কারণ, মানুষকে ভালবাসলে মানুষ খুশি হয়। যেহেতু মানুষের কাছ থেকেই বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ, সহানুভূতি, সাহায্য ইত্যাদি পেতে হবে আপনাকে, তাই তাকে ভালবেসে তাকে খুশি করুন, সে আপনার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হবে।

কাউকে গভীর আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করলে সে নিজেকে সাধারণের চেয়ে উঁচুস্তরের লোক বলে মনে করে, মনে করে আমার মধ্যে বিশেষ কোনো গুণ আছে, তাই আমার প্রতি এতো গভীর মনোযোগ দেখাচ্ছে। লোকটিকে ভালবেসে ও সাহায্য করে আপনি উপকৃত হবেন। সে আপনার প্রতি, আপনার বক্তব্য, সমস্যা এবং কাজের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখাবে।

গভীর আগ্রহবোধকে আপনি হাজার রকম কাজে ব্যবহার করে সুফল পাবেন। যার মধ্যে এই বোধটি নেই সে একটি মূল্যবান গুণ থেকে বঞ্চিত। এই গুণটি আপনার মধ্যে আমদানী করুন। আপনার অধিকারে এই গুণ থাকলে আপনি তরতর করে উপরদিকে উঠে যাবেন, ক্ষমতার অধিকারী হবেন, সম্পদের মালিক হবেন, আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন।

দুশ্চিন্তামুক্ত হতে চান? আজেবাজে, ক্ষতিকর চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে চান? কাজে এবং কথায় গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠুন। হাতেনাতে যাদুমন্ত্রের মতো অনুকূল ফল পাবেনই।

গভীর আগ্রহবোধের মূল্য এবং তাৎপর্য কতোটুকু, নিশ্চয়ই বুঝেছেন। কিন্তু মূল্য এবং তাৎপর্য বুঝলেই তো হবে না, এই গুণটির অধিকারী হতে হবে আপনাকে, তাই না? গভীর আগ্রহবোধের অধিকারী হওয়া যায় এমন কোনো উপায় আছে কি?

উপায় আছে। শিখে নিলেই হয়।

এই বিশেষ গুণটির অধিকারী হওয়ার উপায় শেখার শুরুতেই আপনি জেনে নিন কয়েকটি বোধ বা গুণের সমষ্টি হলো গভীর আগ্রহবোধ।

তার মধ্যে একটি হলো: অভিপ্রায়।

অভিপ্রায়কে আমরা উদ্দেশ্য বলতে পারি। অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য না থাকলে কোনো জিনিস অর্জন করার ইচ্ছা জাগে না। ধরুন, চাকরি পাওয়াটা আপনার অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য নয়, সেক্ষেত্রে আপনি কি চাকরির জন্যে চেষ্টা করবেন? চাকরি পাবার ইচ্ছা থাকবেই না আপনার মধ্যে।

উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় আগে ঠিক করে নিন, তারপর উদ্দেশ্য হাসিলের পথে নামুন। প্রশ্ন করতে পারেন, অভিপ্রায় কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন। নিন ব্যাখ্যা।

আপনি কিছু কামনা করুন, কিছু দাবি করুন, কিছু আশা করুন–এর যে-কোনোটাই আপনার অভিপ্রায়। সুন্দর একটি এলাকায় চমৎকার একটি বাড়ি তৈরি করতে চান–এটা হতে পারে আপনার একটা অভিপ্রায়।

অসংখ্য বিষয় বা বস্তুকে আপনি আপনার অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। একটু চিন্তা করলেই দেখবেন, আপনার চাওয়ার শেষ সীমা নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি চাওয়াই আপনার অভিপ্রায় হতে পারে না।

চাওয়ার পিছনে জোর থাকতে হবে, চাইলে কায়মনোবাক্যে, প্রত্যক্ষ-দর্শনের মাধ্যমে, সুখী মনোভাব নিয়ে, জীবনে সাফল্য লাভের একটি অংশ বলে মনে করে, অন্তর দিয়ে, উৎসাহের সাথে চাইতে হবে। তবেই হবে সেটি আপনার একটি অভিপ্রায়।

অভিপ্রায়ের পর আসছে: অর্জন করতে পারবেন এই জ্ঞান।

অভিপ্রায় নির্দিষ্ট হলে আপনাকে সতর্কভাবে ভাবতে হবে অভিপ্রেত বস্তুটিকে বাস্তবে রূপ দেয়া কিভাবে সম্ভব। অথচ, অভিপ্রায় নির্ধারিত করার পর অধিকাংশ লোক কি ভাবে জানেন? ভাবে, উদ্দেশ্য তো ঠিকই আছে, কিন্তু আমার দ্বারা কি কাজটা করা সম্ভব?

নিজেকে এই যে প্রশ্ন, এটা পরিষ্কার সন্দেহ এবং ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করছে। কেউ বৈজ্ঞানিক হতে চায়, কেউ ব্যবসা করতে চায়,

কেউ নাবিক হতে চায় অথচ শেষকালে দেখা যায় এরা যা হতে চেয়েছিল তা হতে পারেনি। কেন পারেনি? খোঁজ নিয়ে, তদন্ত চালিয়ে দেখুন, অধিকাংশের ক্ষেত্রে একটিমাত্র কারণ খুঁজে পাবেন–এরা নিজেদের যোগ্যতা, গুণ, ক্ষমতা এসবের প্রতি আস্থাবান ছিলো না। উদ্দেশ্যটা যে তাদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব একথা তারা নিজেরাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেনি।

ভুলেও কেউ যদি ভাবে অভিপ্রেত বস্তুটি অর্জন করা আমার দ্বারা সম্ভব নাও হতে পারে–তার দ্বারা সত্যি সাফল্যলাভ নাও হতে পারে।

আপনাকে এই বিপদ থেকে সাবধানে থাকতে হবে। আপনি যদি বলেন, পারবো-না–শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা, পারার চেষ্টাই আপনি করবেন না। যদি বলেন, নাও পারতে পারি–সন্দেহ রয়েছে আপনার, সন্দেহ থাকলে কাজে হাত দেয়া বোকামি, কারণ ব্যর্থ হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে তাতে। যদি বলেন, পারবো কি!–এতেও রয়েছে সন্দেহ এবং ভয়, সুতরাং পরিত্যাজ্য। যদি বলেন, বোধ হয় পারবো–বোঝা যায় আপনার নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা নেই। যদি বলেন, পারবো কিনা জানি না–এতেও নিজের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হয়। হয়তো পারবো, পারি কিনা দেখি চেষ্টা করে, মনে হয় পারবো, পারতেও পারি, পারি বা না পারি দেখি একবার নেড়েচেড়ে–এই ধরনের কথা ভাবা আসলে ক্ষতিকর, নিজের প্রতি অনাস্থার, কাজের প্রতি ভয়ের পরিচায়ক।

আপনাকে ভাবতে হবে জোর দিয়েঃ পারবো। অবশ্যই পারবো। নিশ্চয়ই পারবো।

নেতিবাচক মনোভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে আপনাকে। আপনি বিশ্বাস করবেন, পারবো, আমার দ্বারা একশোবার সম্ভব।

এরপর আসছেঃ দৃঢ় সংকল্প।

স্মরণ করে দেখুন, যাদের সাথে নিত্যদিন আপনার দেখা হয় এখানে সেখানে তারা দেখা হলেই বলে কিনা এটা করবো, ওটা করবো? আপনার আশপাশে এমন প্রচুর লোকের সন্ধান আপনি

পাবেন। যাদের মুখে লেগেই আছে এটা করবো, ওটা করবো। কিন্তু তাদের মধ্যে কাজটা করে ক'জন, মাত্র দু'একজনে, তাই না?

আমি পনেরো বছর আগে এক বাকপটু ভদ্রলোককে বলতে শুনেছিলাম, অমুক কাজটি করতে যাচ্ছি আমি। পনেরো বছর গত হয়ে গেছে তারপর। ইদানীং হঠাৎ করে তার সাথে আমার আবার দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোকের চুলে পাক ধরেছে, রেখা পড়েছে মুখে–বয়স বাড়ার ছাপ ফুটে উঠেছে সর্বত্র। অনেক বদলে গেছেন তিনি। কিন্তু দেখা হবার পর কথায় কথায় আমাকে জানালেন–অমুক কাজটি করতে যাচ্ছি আমি।

ভাবুন একবার! গত পনেরো বছর ধরে কাজটা করতে চাইছেন তিনি!

শুধু এই ভদ্রলোকই নন, অধিকাংশ মানুষই বলে করবো, কিন্তু করে না। কেন করে না? কেউ কি তাদেরকে কাজটি করতে বাধা দেয়?

দেয়। তবে বাধাটা অন্য কোনো মানুষের তরফ থেকে আসে না। বাধাটা আসে সংকল্পের অভাব হেতু, নিজের মধ্যে থেকেই। এই ধরনের মানুষ নিজেদেরকে নিজেরাই নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে।

যার মধ্যে দৃঢ় সংকল্প নেই, জেদ নেই তার নিজের দ্বারা বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। জেদ জিনিসটা আসলে খুবই উপকারী, যদি তা গঠন বা উন্নয়ন-মূলক কোনো কাজে প্রয়োগ করতে পারেন।

দৃঢ় সংকল্পের অভাব কেন হয় মানুষের মধ্যে?

অনেকগুলো কারণ আছে।

তার মধ্যে একটি হলো: অকাজ বা গুরুত্বহীন কাজ।

কাজ অনেক রকম, সবগুলোই কি আপনার জন্যে উপকারী? তা নয়। কাজটি কি তা নির্ধারণ করার আগে অর্থাৎ অভিপ্রায় নির্দিষ্ট করার আগে আপনি বিবেচনা এবং বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে চিন্তা করে দেখুন যে কাজটি করতে চান বলে ভাবছেন সেটি আপনার জন্যে কতোটা উপকার বয়ে আনবে, কি পরিমাণ লাভবান হবেন আপনি। কাজটাকে

কাজের কাজ হতে হবে। তবেই না সেটা করার জন্যে আপনি আগ্রহী হবেন, সংকল্প গ্রহণ করবেন দ্রুত এবং নিখুঁত ভাবে সেটা সম্পন্ন করার জন্যে।

একটা মূল কাজের অংশ নিজেই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে মূল কাজটার প্রেক্ষিতে, কিন্তু অংশটি এককভাবে তেমন কোনো গুরুত্ব বহন নাও করতে পারে–এই ধরনের আংশিক বা আনুষঙ্গিক কাজকে অবহেলা করতে বলছি না আমি। আমি বলছি সেই সব কাজের কথা যা কিনা নির্দিষ্ট ফলাফল দিতে অপারগ। ধরুন, জুয়ার কথা। এটিকে একটি কাজ মনে করতে পারেন। রোজ সন্ধ্যার পর আপনি খেলতে যান। নির্দিষ্ট ফল দিতে এই কাজ সমর্থ নয়, এটা প্রমাণিত সত্য। সুতরাং, এই কাজ আপনি করবেন না, আপনার করা উচিত নয়। পাকা জুয়াড়ীদেরকে দেখে আমি একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝেছি, তারা আর জেতার জন্যে জুয়া খেলতে বসে না, এতোদিন ধরে তারা যা হেরেছে তার কিছুটা ফিরে পাবার আশায় খেলতে বসে। এদের মধ্যে আমি আবিষ্কার করেছি নৈরাশ্য, নিজের প্রতি অনাস্থা। এতোদিনে তারা টের পেয়ে গেছে, জুয়া খেলাটা কোনো কাজের কাজ নয়, গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়, নির্দিষ্ট ফলপ্রসূ কাজ নয়–যার ফলে তারা এই জুয়া খেলা কাজটির প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে।

জুয়া একটি অকাজ বা গুরুত্বহীন কাজ। দৃঢ় সংকল্পের এখানে কোনোই ভূমিকা নেই। জুয়া খেলে জিতবো–এই সংকল্প গ্রহণ করে না কেউ। সংকল্প গ্রহণের ফলে কেউ জেতে না। সুতরাং, জুয়াড়ীর মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের অভাব থাকবে।

কোনো কাজ অকাজ বা গুরুত্বহীন কিনা তা অনেক সময় নির্ভর করে সময়ের উপর। অফিস কামাই করে যদি কেউ মাছ ধরতে ব্যয় করে সারাটা দিন–এক্ষেত্রে মাছ ধরাটা অকাজ। ছুটির দিন মজা পাবার জন্যে মাছ ধরতে যান–সেক্ষেত্রে এটা একটা খেলা, একটা আনন্দদায়ক ঘটনা, অকাজ নয়। খেলাও ফলপ্রসূ একটা কাজ। খেলারও প্রয়োজন আছে আপনার।

অফিস কামাই করে মাছ ধরতে গিয়ে দেখুন, মাছ ধরার কাজে উৎসাহবোধ করার চেয়ে অস্বস্তিবোধ করবেন অনেক বেশি। মাছ ধরার প্রতি তেমন মনোযোগী হতে পারবেন না। অথচ আপনার মাছ ধরতে যাবার মূল উদ্দেশ্য: মাছ ধরে মজা পেতে হবে আপনাকে। মজা পাবার জন্যে দৃঢ়ভাবে সংকল্পিত হয়ে পুকুর পাড়ে নেমেছেন আপনি। কিন্তু দৃঢ় সংকল্প আপনার মধ্যে এতোটুকু থাকবে না, অফিস কামাই করে একটা অকাজ করার পিছনে সময় অপব্যয় করছেন বলে।

দৃঢ় সংকল্পের অভাব হবার অন্যতম আর এক কারণ হলো, নেতিবাচক ভঙ্গিতে চিন্তা করার কু-অভ্যাস। পারবো না, হবে না, সম্ভব নয়–এই রকম ভাববেন না কক্ষনো। আপনার ভাবনা-চিন্তার পদ্ধতি বদলে ফেলুন, ভাবুন–হবে, পারবো, সম্ভব। অর্থাৎ ইতিবাচক ভঙ্গিতে চিন্তা করতে শিখুন। তাহলেই দৃঢ় সংকল্পের অভাব ঘুচে যাবে আপনার মধ্যে থেকে।

এই পরিচ্ছেদে আপনি শিখছেন কিভাবে গভীর আগ্রহবোধের অধিকারী হওয়া যায়। ইতোমধ্যে আপনি শিখেছেন অভিপ্রায় নির্ধারিত করলে, দৃঢ় সংকল্প নিজের মধ্যে আমদানী করলে গভীর আগ্রহবোধের অধিকারী হওয়া যায়।

এবার: আত্ম-উপলব্ধি।

আত্ম-উপলব্ধিও অভিপ্রায় এবং দৃঢ় সংকল্পের মতো একটা গুণ। এইসব গুণেরই সমষ্টি হলো গভীর আগ্রহবোধ।

আত্ম-উপলব্ধি।

ধরুন, নিজের কদর বোঝেন আপনি, নিজের প্রশংসা করেন মনে মনে। এতে কি প্রমাণ হয় আপনি অহমিকায় ভুগছেন? না, মোটেই তা প্রমাণ হয় না।

আপনি যা, নিজেকে আপনি তাই বলে মনে করবেন, এতে দোষ কিছুই নেই। এবং যেহেতু আপনি আর সকলের মতোই একজন মানুষ, তাই আপনার সম্ভাবনা অন্য কারো চেয়ে এতোটুকু কম নয়। যে-কোনো মানুষের সমকক্ষ হতে পারেন আপনি। মানুষের যতোগুলো

ভালো গুণ আছে, সবই আছে আপনার মধ্যে। সুতরাং ভালো গুণগুলো আছে বলে নিজের প্রশংসা করবেনই তো আপনি।

আসলে, আপনি নিজের সম্পর্কে যা ভাববেন না, যা বিশ্বাস করবেন না–দুনিয়ার কেউ আপনার সম্পর্কে তা ভাববে না, বিশ্বাস করবে না। আপনি যদি নিজেকে বহু গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি বলে মনে করেন, লোকেও আপনাকে তাই মনে করবে।

যে ডাক্তার বা আইনবিদের নিজের উপর আস্থা নেই তার উপর কি নিজের সন্তানের চিকিৎসা, কিংবা কোনো আইনসংক্রান্ত দায়িত্ব দিতে চাইবেন আপনি?

কোনোদিন ভেবে দেখেছেন, আপনার মধ্যে হাজারো গুণ আছে? আসলে, না থেকে পারে না। আছেই আছে, আপনি জানুন বা না জানুন।

এবং সেইসবগুলোকে কাজে লাগতে দেখা মানেই নিজেকে উপলব্ধি করা।

কিন্তু অবশ্যই আপনাকে লক্ষ রাখতে হবে আত্ম-উপলব্ধির ফলে আপনার মধ্যে যেন সন্তুষ্টি পয়দা না হয়। সন্তুষ্টি আসলে একটি বেড়া, ব্যারিকেড। সন্তুষ্ট ব্যক্তি এগোয় না, এগোবার প্রয়োজন বোধ করে না সে।

অনেকে মনে করে নিজেকে পছন্দ করা মানে আত্ম-উপলব্ধি করা। তা সত্যি নয়। নিজেকে নয়, নিজের কাজকে; যা ভাবছেন, যা করছেন সেই ভাবনা এবং কর্মকে পছন্দ করা মানে আত্ম-উপলব্ধি।

সুখ

কোন্‌টা আগে, মুরগী না ডিম? সুখবোধ গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করে। সেই রকম গভীর আগ্রহবোধ জন্ম দেয় সুখবোধের।

সুখী হওয়াটা জরুরী। আগে দরকার।

সবচেয়ে ভালো হয়, সুখ-এর উপর লেখা পরিচ্ছেদটি এই ফাঁকে জরুরী মনে করে আর একবার পড়ে নিলে।

আগে সুখী বলে মনে করুন নিজেকে, তারপর পড়তে শুরু করুন ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অতৃপ্তি

প্রায় সবার মুখেই এই রকম কথা শোনা যায়: যা আছে তোমার তাতেই তুমি তৃপ্ত থাকো, যা পেয়েছো তাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত, অতৃপ্তি ভালো নয়, অসন্তুষ্ট হওয়া অনুচিত–অর্থাৎ অতৃপ্ত এবং অসন্তুষ্টির বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার। প্রচলিত ধারণা হলো, অতৃপ্তি এবং অসন্তুষ্টি খারাপ জিনিস।

আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনিও কি তাই মনে করেন? অতৃপ্তি খারাপ জিনিস? অতৃপ্ত হওয়া উচিত নয়? যদি বলেন, হ্যাঁ, অতৃপ্তি খারাপ জিনিস বলেই জানি তাহলে আমি বলবো, আপনি ভুল জানেন।

অতৃপ্তি খারাপ কি ভালো, আমার কাছ থেকে জেনে নিন। আমি আপনাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে চাই, অতৃপ্তি ভালো জিনিস তো বটেই, অতৃপ্তিবোধ আপনার মধ্যে একান্তভাবে থাকা প্রয়োজন।

যে লোক তৃপ্ত, সন্তুষ্ট সে লোক স্থির, দণ্ডায়মান। তৃপ্তিলাভ করা মানে স্থির হয়ে যাওয়া। তৃপ্ত মানুষ আলসে হয়, তাকে ধাক্কা দিয়েও নাড়ানো সহজ নয়। কেননা তৃপ্ত মানুষের চাহিদা থাকে না।

ধরা যাক, আপনি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করলেন: বারোশো টাকা বেতনের একটা চাকরি। এই বেতনের একটা চাকরি পেলেই আপনি সন্তুষ্ট, আর কিছু চাইবেন না। চেষ্টা-চরিত্র করে পেলেন বারোশো টাকা বেতনের একটা ভালো চাকরি। তারপর? আর উন্নতি হবে আপনার,

আরো বেশি বেতনের চাকরি পাবেন আপনি?

যদি তৃপ্ত থাকেন, চেষ্টাও করবেন না, পাবেনও না। কিন্তু যদি বারোশো টাকা বেতনে অতৃপ্ত থাকেন, পনেরোশো, তারপর দু'হাজার, তারপর আড়াই হাজার এইভাবে আরো বেশি বেতনের চাকরির জন্যে চেষ্টা করবেন আপনি, চেষ্টা করলে পাবেনও।

তৃপ্ত হওয়া আসলে ভালো নয়। মানুষের অতৃপ্তিই স্পৃহা যুগিয়েছে মানবসভ্যতাকে গড়ে তুলতে। যতো বড় বড় আবিষ্কার, মহৎ শিল্পকর্ম, বিস্ময়কর সাফল্য–এই অতৃপ্তির বদৌলতেই সম্ভব হয়েছে সেসব।

মধ্যযুগে মালামাল বহন করার জন্য গাধা ছিলো, ঘোড়া ছিলো। মানুষ যদি এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতো, ফলাফল কি দাঁড়াতো? আজও কি আমরা, এই যুগের মানুষরা, গাধা-ঘোড়ার উপর নির্ভরশীল থাকতাম না মাল পরিবহনের জন্যে?

মধ্যযুগের মানুষরা যদি সন্তুষ্ট থাকতো, যান্ত্রিক যানবাহন আবিষ্কৃত হতো না। ধনকুবের ওনাসিসের কথা ধরুন। তিনি যদি নিজের দৈন্য দশায় তৃপ্ত থাকতেন, পারতেন কি তিনি কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে? আপনি যদি আপনার বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন, উন্নতি করা, আরো সমৃদ্ধি অর্জন করা কি আপনার দ্বারা সম্ভব?

কোনো মানুষই সত্যিকার অর্থে তৃপ্ত নয়। কেউ যদি বলে, আমার মধ্যে অতৃপ্তি নেই, আমার যা আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট–তার উদ্দেশে আমি বলবো, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ভুল তথ্য জানো তুমি তাই নিজেকে তৃপ্ত বলে মনে করতে বাধ্য করো, নয়তো, তুমি ভীতু বলে নিজেকে অতৃপ্ত জেনেও তা স্বীকার করো না।

সিদ্দিক চৌধুরীর কথা ধরুন। অঙ্কন শিল্প এবং শিল্পী সম্পর্কে এর ভুল ধারণা আছে।

বেশি লেখাপড়া শেখেনি সিদ্দিক চৌধুরী। ঢাকা শহরের একটা বড়সড় রেডিমেড পোশাকের দোকানে সেলসম্যানের চাকরি করে। সুদর্শন, আদব-কায়দা জানে, সাধারণ সেলসম্যানদের চেয়ে তাই ওর বেতন অনেক বেশি। যা পায়, তাতে খেয়েদেয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

চাকরিতে উন্নতি করার চেষ্টা সে বিশেষ করে না, কারণ, ওর লাইনে সর্বোচ্চ বেতন হতে পারে এক হাজার টাকা, পাচ্ছে ও ওই এক হাজার টাকাই প্রতি মাসে।

অথচ, ছবি আঁকার চমৎকার হাত ওর। কারো কাছ থেকে শেখেনি, নিজেই চর্চা করে শিখেছে।

শিল্পী হবার সাধ হয় ওর। কিন্তু শিল্পীদের জীবন সম্পর্কে প্রচলিত এবং প্রায় আজগুবী নানা কিংবদন্তী জানা আছে ওর, সে-সব কিংবদন্তী অজ্ঞ লোকেরা শুনিয়েছে ওকে। শুনে শুনে ওর বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে শিল্পী মাত্রই অভাবগ্রস্ত, বাউণ্ডুলে, নীতিহীন, শিল্পীদের জীবন বিড়ম্বনায় পরিপূর্ণ, সুখ, শখ, সাধ ইত্যাদি তারা পূরণ করতে পারে না এবং শেষ বয়সে শিল্পীরা না খেতে পেয়ে রোগে ভুগতে ভুগতে বিনা চিকিৎসায় অসহ্য যন্ত্রণা পেয়ে মারা যায়। শিল্পীরা যে-সব ছবি আঁকে তা ভুলেও কখনো কেউ কেনে না, এই মিথ্যে ধারণাও রয়েছে ওর মধ্যে।

শিল্পীদের জীবন আতঙ্ককর বলে মনে করে সিদ্দিক চৌধুরী, তাই শিল্পী হতে রাজি নয় সে, বর্তমান অবস্থায় অগত্যা সে নিজেকে তৃপ্ত থাকতে বাধ্য করছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভুল ধারণা রয়েছে বলেই সিদ্দিক চৌধুরী তার অতৃপ্তিবোধটাকে দমন করে রেখেছে, নিজেকে বিকশিত হতে দিচ্ছে না।

আর একটা কারণ, ভয়।

অনেকে অনেক কিছু হতে চায়, কিন্তু ভয় তাদেরকে এগোতে দেয় না। আমি একজন লোককে চিনি যে ছোটো খাটো একটা ব্যবসা করে কিন্তু ব্যবসাটা তেমন চালু নয় বলে সংসারে সচ্ছলতা আসছে না। বিদেশ থেকে আমদানী করা কাঁচামাল কালোবাজার থেকে কিনে কারখানায় তৈরি করে সে নানা ধরনের পাউডার, স্নো, ক্রিম, লিপস্টিক। খরচ অনেক বেশি পড়ে বলে লাভ যা হয় তাতে পোষায় না। লোকটার ব্যাপারে জানতে পেরে তাকে আমি পরামর্শ দিলাম, কালোবাজার থেকে কাঁচামাল না কিনে বিদেশ থেকে

আমদানী করুন, সরকারের কাছে আবেদন করুন লাইসেন্স পাবার জন্যে।

বছর তিনেক পর আবার দেখা লোকটির সাথে। ব্যবসার অবস্থা জানতে চাইলে সে যা বললো তার সারমর্ম হলে আগের অবস্থাতেই স্থির হয়ে আছে ব্যবসা। লাইসেন্স পেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করতে বললো, 'কন্ট্রোলার অফ ইমপোর্ট-এর অফিসে একদিন গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি সুটেড-বুটেড দামী কাপড়-চোপড় পরা শিক্ষিত ধনী রুইকাতলারা ছুটোছুটি করছে, ফটাফট কথা বলছে ইংরেজিতে। দেখেশুনে ভয়ই পেলাম। লাইসেন্সের জন্যে আবেদন যে করবো, ইংরেজি লিখতেই তো পারি না। দরকার নেই লাইসেন্স পেয়ে, লাইসেন্স পাবার যোগ্যতা আমার নেই!' হীনম্মন্যতার শিকার এই লোক, যার ফলে নিজেকে খারাপ অবস্থায় তৃপ্ত থাকতে বাধ্য করছে সে।

আমি যোগ্য নই—এটা একটা অমূলক ভয়, এই ভয় অনেক সময় মানুষকে তৃপ্ত থাকতে বাধ্য করে।

অতৃপ্ত মানুষকে আবার প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক দল কাজ করে, অপর দল নিজের হাত কামড়ায়। শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষ তাদের বর্তমান অবস্থায় অখুশি, অতৃপ্ত এবং অসন্তুষ্ট। এদের মধ্যে অধিকাংশই হা-হুতাশে কাল কাটায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নৈরাশ্যে হাবুডুবু খায় অর্থাৎ নিজেদের হাত কামড়ায়।

পরিশ্রমকে ভয় পায় অনেকে। পরিশ্রম করার চেয়ে বর্তমান অবস্থায় তৃপ্ত থাকা ভালো—এইরকম ভাবে তারা। ভালো একটা ক্রিকেট ব্যাট কেনা দরকার এক শিক্ষানবিস খেলোয়াড়ের। তার বাড়ির কাছাকাছি যে-সব দোকান আছে সেগুলোয় তেমন ভালো ব্যাট কিনতে পাওয়া যায় না। ভালো ব্যাট কিনতে হলে যেতে হবে বিশ মাইল পথ অতিক্রম করে বড় কোনো শহরের দোকানে। বিশ মাইল পথ অতিক্রম করার পরিশ্রম যদি সে স্বীকার না করে, কাছাকাছি দোকান থেকে খারাপ ব্যাট কিনেই তৃপ্ত থাকতে হবে

তাকে। এ থেকে প্রমাণ হয়, পরিশ্রমের ভয়ে অতৃপ্তিবোধকে মূল্য দিচ্ছে না সে।

আপোসমূলক মনোভাব

অধিকাংশ মানুষ তার নিজের দুরবস্থাকে মেনে নেয়। সচেতন বা অচেতন ভাবে তারা অনুভব করে, আমার কপালের লিখনই এই, কি আর করার আছে! এরা হয় অলস, নয় ভীতু কিংবা হীনম্মন্যতায় ভুগছে। এরা জানে না, কপালের লিখন বলে কোনো জিনিস নেই, যে যার ভাগ্য নিজেই গড়ে তার কর্ম দ্বারা।

এক ভদ্রমহিলা আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'এমন কপাল, কোনো বন্ধু নেই আমার।' প্রশ্ন করে জানলাম, বন্ধু সংগ্রহ করার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি। তাঁকে কেউ শেখায়নি যে বন্ধু পেতে হলে আগে বন্ধু হতে হবে নিজেকে।

এই মহিলা যদি বন্ধুত্বহীনতার সাথে আপোস না করে বন্ধু না থাকায় অতৃপ্তি বোধ করতেন তাহলে বন্ধুর অভাব ঘটতো না তার।

অতৃপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আপোসমূলক মনোভাবের দরুন অধিকাংশ মানুষ নিজেকে তৃপ্ত থাকতে বাধ্য করে। বলুন তো কার না গাড়ি কিনতে, বাড়ি তৈরি করতে, ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে, দামী দামী ফার্নিচার কিনতে, বিদেশ ভ্রমণ করতে ইচ্ছা না হয়? শখ সাধ নেই কার মধ্যে? এক লক্ষ লোককে প্রশ্ন করে দেখুন, তারা সবাই বলবে, চাই, চাই, এটা চাই, ওটা চাই, সম্ভাব্য সব কিছু চাই।

কিন্তু কেন তারা যা যা চায় তা-তা পায় না? কারণ সেই একটাই, তারা অতৃপ্তিবোধকে দমিয়ে রাখে, বর্তমান অবস্থাকে মেনে নেয়।

'শিল্পী হওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়।' অনেকে বলে। এতে কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয়, শিল্পী হওয়ার ইচ্ছা তাদের মনে জাগে। ইচ্ছা জাগে কেন? জাগে এই জন্যে যে, অবচেতন মন এবং প্রকৃতি তাদেরকে ইঙ্গিতে বলে দিচ্ছে, তোমরা শিল্পী হতে পারবে।

অবচেতন মন কক্ষনো ভুল বা মিথ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করে না। কিন্তু

এক ধরনের লোক আছে যারা অবচেতন মনের ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ আস্থা, পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে না। এরা যদি বিশ্বাস রাখতো, যদি 'পারবো না' থেকে না শব্দটি বাদ দিয়ে বলতো পারবো, তাহলেই এরা হয়তো বড় শিল্পী হতে পারতো।

আপোসমূলক মনোভাব কাপুরুষতার লক্ষণ। আপনি মানুষ, কেন আপনি আপনার দৈন্য দশাকে মেনে নেবেন? কেন আপনি প্রচুর টাকা রোজগার করতে চাইবেন না, কেন গাড়ি কিনতে বাড়ি তৈরি করতে চাইবেন না? আপনার মন এসব জিনিস চায়–কেন তাকে আপনি বঞ্চিত করবেন?

নিজের মধ্যে অতৃপ্তিবোধ আমদানী করুন। ভাবুন, আমার বাড়ি নেই, একটা বাড়ি তৈরি না করা পর্যন্ত আমার তৃপ্তি নেই।

বাড়ি চান, এই বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাবেন, সেটা পাবার জন্যে জেদ থাকবে আপনার মধ্যে, যতোক্ষণ না পান ততোক্ষণ অতৃপ্ত থাকবেন আপনি।

ধরুন, একটা বাড়ির জন্যে অতৃপ্তি ছিলো আপনার, সুপরিকল্পনার মাধ্যমে, প্রত্যক্ষদর্শনের মাধ্যমে পেলেন সেটা–মিটলো অতৃপ্তি?

মেটা উচিত নয়। কোনো না কোনো, একটা না একটা জিনিসের জন্যে আপনার মধ্যে সর্বক্ষণ অতৃপ্তি থাকতেই হবে। একটা অতৃপ্তি মিটেছে, আরো একটা মেটান। বাড়ি হয়েছে, এবার গাড়ির জন্যে অতৃপ্তি বোধ করুন। গাড়ি হবার পর, নতুন ফার্নিচারের জন্য অতৃপ্ত হোন। শুধু যে বস্তুগত উপকরণের জন্যে আপনি অতৃপ্ত বোধ করবেন তা নয়। প্রতিষ্ঠা অর্জনের, পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার, নেতৃত্ব লাভের, জ্ঞান অর্জনের, সম্মান বৃদ্ধির জন্যেও আপনাকে অতৃপ্ত থাকতে হবে। আপনি যা হতে চান তার জন্যে অতৃপ্তিবোধ না করলে হবেন কিভাবে? এলাকাব্যাপী সম্মান পেয়েছেন, এবার দেশব্যাপী সম্মান পাবার চেষ্টা করুন, তারপর নেতৃত্ব লাভ করার জন্যে অতৃপ্ত হোন। এইরকম পদ্ধতিতে নিজেকে সবসময় একটা না একটা ব্যাপারে অতৃপ্ত রাখুন।

অতৃপ্তির সংখ্যা-সীমা নেই। ভুলেও কখনও সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হবেন না। চূড়ান্তভাবে তৃপ্ত-হওয়া মানে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেয়া।

বয়সের দোহাই অচল

অতৃপ্ত অনেক মানুষ তাদের অতৃপ্তিকে গুরুত্ব দেয় না, একের পর এক অতৃপ্তি মিটিয়ে তৃপ্ত হবার চেষ্টা করে না। এই ধরনের লোকেরা নানারকম যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করে।

বয়স্ক কিছু লোক আছে, যারা বয়সের দোহাই দিয়ে বলে, জীবনে পরিবর্তন আনার জন্যে যে বয়স দরকার তা আমার নেই, বুড়ো হয়ে গেছি।

এই বয়স্ক লোকগুলোর মধ্যেও অতৃপ্তি আছে, কিন্তু বয়সের অজুহাত দেখিয়ে এরা অতৃপ্তিকে দমিয়ে রাখে। এটা উচিত নয়।

মানুষ বুড়ো হলে কি তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় বা কমে যায়? সুখ, আরাম, আয়েস, উপভোগ ইত্যাদি কি তার দরকার হয় না?

দরকার হয়। বরং, অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে দরকার হয়। এবং বয়সটা কোনো মতেই একটা বাধা নয়। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে, বুড়ো বয়সে মানুষ উন্নতি করেছে, সমৃদ্ধি অর্জন করেছে।

মানুষ বুড়ো হয় কখন? বয়সটাই কি বুড়ো হবার লক্ষণ? তা নয়। মনটা যদি বুড়ো হয়ে যায় অর্থাৎ কোনো যুবকের মনও যদি তৃপ্তি লাভ করে চূড়ান্তভাবে, তাকে বুড়ো বলা চলে। শরীর বুড়ো হলে কিছু যায় আসে না, মনটা যুবক থাকলে নিজেকে বুড়ো মনে না করে যুবক ভাবতে পারেন অনায়াসে। শতবর্ষের কাছাকাছি বয়স এমন অনেক মানুষকে যুব-মানসিকতার অধিকারী থাকতে দেখেছি আমি। দেহটা তাদের সত্যি জরাগ্রস্ত কিন্তু মনটা তাজা, উৎসাহে ভরপুর, প্রফুল্লতায় ঝকঝকে, আনন্দে উজ্জীবিত। এরা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যুবক থাকে।

প্রখ্যাত কন্সালটিং সাইকোলজিস্ট বেন সুইটল্যাণ্ডের কথা ধরুন।

নিজের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমার জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছরে আমি যতোটুকু অর্জন করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি অর্জন করেছি পঞ্চাশের পর মাত্র অল্প ক'বছরে। পঞ্চাশের ক'বছরে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার তুলনায় শতগুণ বেশি সাফল্য লাভ করেছি আমি ষাটের পর।'

বেন সুইটল্যাণ্ড এখনো থামেননি, সাফল্যের পথে যাত্রায় তাঁর অগ্রগতি মন্থর হয়ে পড়েনি। যদিও তিনি প্রচুর সয়-সম্পত্তির মালিক এখন, তবু অতৃপ্তির সীমা নেই তাঁরও। কাম্যবস্তুর দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে রেখেছেন তিনি, এক এক করে প্রত্যেকটি কাম্যবস্তু অর্জন করার দৃঢ় সংকল্প কাজ করছে তাঁর মধ্যে।

তিনি মনে করেন, বয়সটা কোনো বাধা নয়। জীবনের শেষ দিনটিতে, শেষ মুহূর্তটিতেও আরো সাফল্য দরকার তাঁর, আরো সুখ দরকার, আরো সমৃদ্ধি দরকার।

আপনার বেলায়ও এই কথা খাটে।

অ্যাকশন

কাজ কি?

মানুষ যা করবো বলে ভাবে তাই কাজ। তার মানে মানুষের চিন্তার ফসল কাজ।

কাজ স্বয়ং কোনো রূপ ধারণ করে না, কাজ নিরাকার। কাজকে বাস্তবে রূপান্তরিত করলে তা নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয়, বিশেষ একটা রূপ ধারণ করে। কেবলমাত্র তখনই তাকে আমরা দেখতে পাই, তার সম্পর্কে ধারণা পাই, তার গুণাগুণ বিচার করতে পারি।

কাজকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হলে কি নিয়ম পালন করতে

হবে আপনাকে? তৎপর হতে হবে, সক্রিয় হতে হবে, অর্থাৎ, হাত-পা নেড়ে, পরিশ্রম করে একটু একটু করে পরিপূর্ণ আকার দিতে হবে কাজটাকে। এই যে পরিশ্রম, এই যে সক্রিয়তা এবং তৎপরতা, একেই বলে অ্যাকশন।

কাজ বা অ্যাকশন দুটো আলাদা জিনিস। অনেককে বলতে শোনা যায়, 'অমুক কাজটা করবো।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কাজটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেনি সে। কেন পারেনি? পারেনি এই জন্যে যে কাজ করার ইচ্ছা তাদের মধ্যে থাকলেও, অ্যাকশন ছিলো না।

খবরের কাগজে এক লোকের কাহিনী ছাপা হলো। সহজ সরল, সাধারণ একটা আইডিয়া থেকে এই লোক অঢেল প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছে।

খবরটা পড়ে অনেকেই মন্তব্য করলো, 'কি জানেন, এইরকম একটা আইডিয়া তো আমার মাথাতেও এসেছিল!'

'আইডিয়াটাকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেননি কেন?' তাদেরকে এই প্রশ্ন করা হলে সবাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তরটা এড়িয়ে যায়।

উত্তরটা এড়িয়ে গেল এই জন্যে যে উত্তরে বলবার মতো কিছু নেই তাদের। আইডিয়া আছে, প্রায় সব মানুষের মধ্যেই অসংখ্য আইডিয়া থাকে, কিন্তু সেটাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে পরিশ্রম করে ক'জন, সক্রিয় এবং তৎপর হয় ক'জন? শতকরা দু'ভাগও নয়। সুতরাং আইডিয়াধারীরা শতকরা আটানব্বই জনই আইডিয়া পুষে রাখে মনে মনে, সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে না। বাকি শতকরা দু'জন পরিশ্রম, সক্রিয়তা এবং তৎপরতার দ্বারা কাজটিকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করে এবং কাগজে উল্লেখিত সেই লোকের মতো সাফল্য লাভ করে, অঢেল প্রাচুর্যের অধিকারী হয়।

অ্যাকশন কাজের বাস্তব মূর্তি তৈরি করে। কিন্তু অ্যাকশন বলতে আমরা কি বুঝি?

অ্যাকশন হলো শক্তির প্রয়োগ।

ফিজিক্সে দু'ধরনের শক্তি বা এনার্জির কথা বলা হয়েছে। পোটেনশিয়াল এবং কাইনেটিক।

আসুন, এই দুই এনার্জি সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করা যাক। এই আলোচনা থেকে আপনার বেশ কিছু শেখবার আছে।

পোটেনশিয়াল এনার্জিকে বলা যায় সম্ভাবনার মধ্যে উপস্থিত একটা শক্তি, যার সত্যিকার বাস্তব কোনো রূপ নেই।

কাইনেটিক এনার্জিকে বলতে পারি মূর্তিমান শক্তি, যে শক্তির প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

আমার, আপনার, সকলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পোটেনশিয়াল এনার্জি বিদ্যমান। পোটেনশিয়াল এনার্জিকে আমরা যখন আড়াল থেকে বের করে আলোর মধ্যে আনি, তাকে গড়িয়ে দিই, ছুটিয়ে দিই, নির্দিষ্ট একটা আকার দিই তখনই সেটা নতুন পরিচয় লাভ করে, সে রূপান্তরিত হয় কাইনেটিক এনার্জিতে।

ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধে হবে আপনার।

ধরুন, লোহার তৈরি আধমণ ওজনের একটা গোল বল, টেবিলের উপর স্থির হয়ে বসে আছে। বলটাকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দিলে কি হবে?

টেবিলের উপর রাখা কাঁচের বাসন-পেয়ালা ভেঙে নিচে পড়বে, থেঁতলে দেবে ভোজনরত অতিথির পায়ের আঙুলগুলো।

বলটা যখন স্থির ছিলো, ওর মধ্যে ছিলো পোটেনশিয়াল এনার্জি। কিন্তু যেই মাত্র গড়াতে শুরু করলো, ওটা আর পোটেনশিয়াল এনার্জি রইলো না, রূপান্তরিত হলো কাইনেটিক এনার্জিতে।

কারণ এবং ফলাফলের আইন

পোটেনশিয়াল এনার্জি সব মানুষের মধ্যেই আছে, আগেই বলেছি। কিন্তু খুব কম মানুষের মধ্যে আছে কাইনেটিক এনার্জি। এর কারণ কি?

যার মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি নেই সে নিষ্ক্রিয়, তাই না? প্রশ্নটা তাহলে দাঁড়ালো, মানুষ নিষ্ক্রিয় হয় কেন?

নিষ্ক্রিয়তা, ইংরেজিতে যাকে বলে ইনঅ্যাক্টিভিটি, এর কারণগুলো এখন ব্যাখ্যা করে বুঝে নেয়া যাক।

মেলভিন পাওয়ার বলছেন, নিষ্ক্রিয়তা কারণ নয়, নিষ্ক্রিয়তা ফলাফল। এবং ফলাফল বদলাতে হলে, কারণ বদলাতে হবে।

নিজের সম্পর্কে অনাস্থা, সময়ের অভাব, জ্ঞানের অভাব, অভিজ্ঞতার অভাব, আলস্য–এই পাঁচটির যোগফল হলো নিষ্ক্রিয়তা। মানুষ নিষ্ক্রিয় হয় এই পাঁচটি বিষয়ের কারণেই।

আসুন, পাঁচটি বিষয়কে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করে দেখা যাক নিষ্ক্রিয়তার জন্যে এরা কে কি পরিমাণ দায়ী।

প্রথমে ধরা যাক–নিজের সম্পর্কে অনাস্থা।

আপনার আশপাশে শত শত লোক পাবেন, যারা নিজেদেরকে অযোগ্য বলে মনে করে। যারা রিকশা চালায় তারা কেন আরো ভালো কোনো পেশা বেছে নেবার চেষ্টা করে না? কারণ অন্য কোনো পেশার উপযুক্ত বলে মনে করে না তারা নিজেদেরকে। অন্য একটি পেশায় ঢোকবার জন্যে যে-সব গুণ এবং উপকরণ থাকা দরকার তা যথেষ্ট পরিমাণে নেই–এই ভুল ধারণাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে উপরে উঠতে দেয় না, সামনে এগোতে দেয় না। তাদের আইডিয়া এবং চিন্তাভাবনারও যে মূল্য আছে, এই উপলব্ধি তাদের মধ্যে আসে না।

প্রমাণিত সত্য হলো, সুস্থ কোনো মানুষের বেলাতেই নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করার প্রকৃত কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন করবেন, তবু অধিকাংশ মানুষ নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করে, নিজের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে না?

কারণটা সাইকোলজিক্যাল। ছোটোবেলায় তাদের মনে যে ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, এ তারই বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

অবিবেচক অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে অহরহ বলে

থাকেন, তুমি পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে নেই, ভাঙবে দেখছি গ্লাসটা, তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না, তোমার মাথায় গোবর আছে নাকি, ইত্যাদি। এই ধরনের বক্তব্য বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোনো ছেলে বা মেয়েকে বললে নিজের সম্পর্কে তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায়, আমার দ্বারা সত্যি কিছু হবে না, আমি আসলে বুদ্ধিমান নই।

এইভাবেই ছোটো ছেলের অবচেতন মনকে জানিয়ে দেয়া হয়, সে অযোগ্য। ছেলে যখন বড় হয়, অবচেতন মন তখন তাকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মনে পড়িয়ে দেয় কথাটা, তুমি যোগ্য নও।

নিজের প্রতি অনাস্থাবোধের শিকার কোনো ব্যক্তি চমৎকার সব আইডিয়ার অধিকারী হতে পারে, কিন্তু আইডিয়াগুলোকে বাস্তবরূপ দেবার সময় মুষড়ে পড়বে সে, সন্দেহে ভুগবে, দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করবে, ভয় পাবে–অযোগ্যতার জন্যে যদি ব্যর্থ হতে হয় এই ভেবে।

জানতে চাইবেন, অনাস্থাবোধের মুঠো থেকে মুক্তি পাবার উপায় আছে কিনা।

উপায় আছে। উপায়টা সহজও বটে।

আমি পারবো না, আমার দ্বারা হবে না–এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তাভাবনাগুলোকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করলেই সুফল ফলবে। বদলে, 'এটা পারবো, ওটা পারবো'–এই ধরনের ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে আপনাকে।

এর আগে বলেছি, আপনি যা চিন্তা করবেন নিজের সম্পর্কে, আপনি তাই। হিপনোটিজম সম্পর্কে দু'একটা কথা বলবো এখন, এই ফাঁকে জেনে নিতে পারবেন যা বলেছি তা সত্য কিনা।

আজকাল আমরা হিপনোটিজম সম্পর্কে শত কথা জানতে পারছি। এই বিষয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ যে ভুল ধারণা ছিলো আমাদের মধ্যে, ক্রমশ তার জায়গা দখল করছে সঠিক তথ্য।

'আমি কক্ষনো সম্মোহিত হবো না।'–সগর্বে এমন দাবি অনেকেই করে থাকে। কি অর্থ দাঁড়ায় এই কথাটার? হয়, সে বলতে চায়, এক,

সে নিজেকে সম্মোহিত হতে অনুমতি দেবে না। কিংবা, দুই, হিপনোটিস্ট তাকে যে জিনিসের উপর গভীর মনোযোগ স্থাপন করার পরামর্শ দেবে তাতে গভীর মনোযোগ স্থাপন করার ক্ষমতা নেই তার।

হিপনোটিস্টদের সংখ্যা কম, এইরকম একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে। আপনি ক'জন হিপনোটিস্টকে চেনেন? বড়জোর একজন কি দু'জনকে চেনেন। বেশিরভাগ লোকের সাথেই কোনো হিপনোটিস্টের পরিচয় নেই। অথচ, কি মজার কথা ভাবুন একবার, আমি আপনি আমরা সবাই আসলে এক একজন হিপনোটিস্ট।

হিপনোটিজম জিনিসটা কি? না-ঘুম না-জাগরণ এমনি একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। হিপনোটিস্ট সাজেশন দেয়, সাবজেক্ট অর্থাৎ পাত্র বা পাত্রী সেই সাজেশন গ্রহণ করে, অনুকূল সাড়া দেয় এবং নির্দেশ মতো আচরণ করে।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা সবাই সাজেশন খয়রাত করে থাকি। যাকে উদ্দেশ্য করে সাজেশন দেয়া তার যদি আমাদের উপর আস্থা এবং বিশ্বাস থাকে, সে নির্ঘাৎ সাজেশন অনুয়ায়ী আচরণ করে–চেতন বা অবচেতন ভাবে।

আত্মসম্মোহন সম্পর্কে মেলা আলোচনা শোনা যায়, কিন্তু আত্মসম্মোহন সম্পর্কে খুব কম লোকেরই পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। অনেকের ধারণা, নিজেকে সম্মোহিত করার জন্যে অসাধারণ একটা মনের অধিকারী হতেই হবে। অথচ, না জেনে, আমরা সবাই, সর্বক্ষণ আত্মসম্মোহনের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি।

আপনি যখন বলেন, 'আমি জানি। কাজে আমি ব্যর্থ হবো।'–আপনি নিজের অজ্ঞাতে তখন আত্মসম্মোহনের একটা রীতি ব্যবহার করছেন। আপনি আপনার অবচেতন মনকে আক্ষরিক অর্থে নির্দেশ দিচ্ছেন, সে যেন এমন চিন্তা করে এবং এমন কাজ করে যার ফলাফল হয় নির্দিষ্ট ওই কাজে ব্যর্থতা।

আপনি যখন বলেন, 'আমি জানি, কাজটা করতে পারবো।'–এক্ষেত্রেও আপনি আত্মসম্মোহনের একটা রীতি ব্যবহার

করছেন। আপনার অবচেতন মনকে আপনি নির্দেশ দিচ্ছেন, কাজটাতে সফলতা লাভ করার জন্যে আমাকে সাহায্য করো বা গাইড করো।

আত্মসম্মোহনের নিয়ম-কানুনগুলোকে আপনার পক্ষে কাজে লাগানো যেমন সহজ, তেমনি আপনার বিরুদ্ধেও কাজে লাগানো সহজ। স্বপক্ষে কাজে লাগাতে হলে আপনাকে ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হতে হবে পারবো না, করবো না, সম্ভব নয়—এগুলোর পরিবর্তে ভাবতে হবে, পারবো, করবো, সম্ভব—ইত্যাদি

এর আগে আপনি পড়েছেন শিক্ষা বা জ্ঞানের কোনো দাম নেই যদি না তা আপনি ব্যবহার করেন। তা যদি সত্যি বলে মানেন, এইমাত্র যা শিখেছেন, সেটাকে ব্যবহার করতে শুরু করুন এই মুহূর্তে।

নেতিবাচক মনোভাবের জায়গায় সযত্নে স্থান দিন ইতিবাচক মনোভাবকে।

আপনার নিজস্ব আইডিয়া, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদির উপর যদি আস্থা না থাকে, যদি সেগুলোকে মূল্যবান বলে মনে করতে বাধা বোধ করেন, নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে চিন্তা করুন:

'আমি একটা সুন্দর, সৃষ্টিশীল মনের অধিকারী, যে মন মূল্যবান, গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা রাখে। আমার চেতনায় যে চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে তা গুরুত্বপূর্ণ, প্র্যাকটিকাল চিন্তা।'

এবার আলোচনা করবো সময়ের অভাব সম্পর্কে।

'চাকরি করি, যা বেতন পাই তাতে সংসারই ভালো চলে না, ব্যবসার জন্যে জমাবো কোত্থেকে!'

ব্যবসার জন্যে টাকা জমাতে পরামর্শ দিলে এক লোক আমাকে এই উত্তরটা দিয়েছিল। কিন্তু উত্তরটা শুনে আমি মনে মনে হেসেছিলাম। তারপর তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'রাত এবং দিন, কখন কিভাবে, কোন্ কাজ করে কাটান, বলবেন আমাকে?'

লোকটা বললো, 'আট ঘণ্টা ঘুমাই। সকাল ছয়টার সময় ঘুম

থেকে উঠি। মুখ হাত ধুয়ে নাস্তা সেরে কাপড়-চোপড় পরতে পরতে বেজে যায় সাতটা। সাড়ে সাতটায় অফিস, দু'মাইল হাঁটতে হয় আধঘণ্টার মধ্যে। অফিস থেকে বের হই দুটোর সময়, বাড়ি ফিরতে আড়াইটা বাজে। স্নানাহার সেরে একটু গড়াগড়ি দিই। বিকেল পাঁচটার সময় ছেলেমেয়েদেরকে পড়াতে বসি। সন্ধ্যার পর একটু হাঁটাহাঁটি করি, শরীরটা ঠিক রাখতে হবে তো। বাড়ি ফিরি আটটার দিকে। খেয়েদেয়ে গিন্নীর সাথে সাংসারিক আলোচনা সারতে বেজে যায় সাড়ে ন'টা দশটা। দশটায় বিছানায় উঠি।'

লোকটাকে বললাম, 'বিকেলে ছেলেমেয়েদেরকে এক ঘণ্টা পড়ান, দু'ঘণ্টা হাঁটাহাঁটি করেন বাইরে–এই দু'ঘণ্টা কিন্তু অপব্যয় করেন শরীর ঠিক রাখার জন্যে সকালে বা দুপুরে স্নান করার আগে পনেরো মিনিট ব্যায়াম করলেই যথেষ্ট। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দৌড়ুনো যায়, জানেন তো? এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ুনোটা খুবই বিজ্ঞানসম্মত একটি ব্যায়াম। এই ব্যায়াম করলে দু'ঘণ্টা হাঁটাহাঁটি না করলে চলবে আপনার।'

লোকটি বললো, 'আচ্ছা, তাই নাকি!'

বললাম, 'দুপুরে ঘুমান বা গড়াগড়ি খান দু'ঘণ্টা। এই দু'ঘণ্টার মধ্যে দেড় ঘণ্টাই আপনি অপব্যয় করেন। কারণ, আট ঘণ্টা রাতে ঘুমুবার পর দিনের বেলা ফের বিছানায় দু'ঘণ্টা কাটাবার কোনো মানে হয় না। একজন মানুষের জন্যে আট ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট। আর, হিপনোটিজমের মাধ্যমে যদি ঘুমটাকে গাঢ় করে নিতে পারেন, তাহলে তো কথাই নেই, সাত ঘণ্টা, এমনকি ছয় ঘণ্টা ঘুমালেও শরীরের কোনো ক্ষতি হবে না আপনার। সে যাক, দুপুরে না ঘুমিয়ে আপনি দেড়টি ঘণ্টা বাঁচাতে পারেন। হাঁটাহাঁটি থেকে দু'ঘণ্টা এবং দুপুরের ঘুম থেকে দেড় ঘণ্টা–মোট সাড়ে তিন ঘণ্টা বাঁচছে আপনার চেষ্টা করলে অন্যান্য কাজ থেকে, যেমন রাতে খেয়েদেয়ে গিন্নীর সাথে গল্প করার সময় থেকে আরো এক দেড় ঘণ্টা বাঁচাতে পারেন। ধরুন, সাড়ে চার ঘণ্টা বাঁচবে মোট।'

লোকটি বললো, 'তা হয়তো বাঁচানো যায়। কিন্তু সময় বাঁচিয়ে কি হবে?'

বললাম, 'পার্টটাইম একটা চাকরি অনায়াসে করতে পারেন আপনি এই বাঁচানো সময়টাতে। টাইপ জানেন, চাকরি না পাবার কারণ নেই। মাসে বেশ কিছু টাকা অতিরিক্ত আসবে।'

লোকটা আমার দিকে বোকার মতো চেয়ে ছিলো অনেকক্ষণ। ব্যবসার জন্যে টাকা জমাবার এমন সহজ একটা উপায় রয়েছে অথচ সে তা দেখতেই পায়নি–এই ভেবে লজ্জাই পেয়েছিল বেচারা। যাই হোক, আমার পরামর্শ অনুযায়ী সময় বাঁচিয়ে একটা চাকরির জন্যে উঠে পড়ে লাগলো সে। এবং, অবশেষে চাকরি পেলোও। পার্টটাইম সেই চাকরি করে প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা করে অতিরিক্ত রোজগার করছে সে। টাকাটা জমাচ্ছে ব্যবসা করবে বলে।

এই বাস্তব ঘটনাটা থেকে প্রমাণ হয়, সময়ের অভাব বলে কোনো জিনিস নেই।

আসলে টাকার বাজেট না করলে যেমন মাস শেষে টাকার টান পড়ে যায় তেমনি সময়ের বাজেট না করলে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে সময়ের অভাব দেখা দেয়।

সময়ের বাজেট চাই

স্বল্প আয়ের কোনো লোক যদি তার টাকার বাজেট না করে, বিপদে পড়তে হবে তাকে। প্রতিমাসে নির্ধারিত খরচ আছে তার: বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, রেশন, বাজার, ওষুধপত্র, কাপড়-চোপড়, স্কুলের বেতন, ইলেকট্রিসিটির বিল, ইন্সুরেন্স–আরো কতো রকম খরচ। বাজেট না করলে আজেবাজে খাতে টাকা খরচ হবেই তার। প্রয়োজনীয় খাতের জন্যে টাকার অভাব ঘটবে তখন।

আপনি টাকার বাজেট করতে অভ্যস্ত? যদি অভ্যস্ত হন, খুবই ভালো। কিন্তু সময়ের বাজেট করেন কি?

টাকার বাজেট করার চেয়ে সময়ের বাজেট করা অনেক বেশি

গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি একটা টাকা হারিয়ে ফেললে সেটা পুনরুদ্ধার বা পুনরায় রোজগার করা সম্ভব। কিন্তু আপনি যদি একটা ঘণ্টা হারিয়ে ফেলেন? পাবেন কখনো আর সেটা ফিরে? পাবেন না। ঘণ্টাটা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল।

বেশিরভাগ মানুষ প্রত্যেকদিন কয়েক ঘণ্টা করে সময় নষ্ট করছে। সকলের নষ্ট করা সময়গুলো একত্রিত করলে দেখা যাবে কয়েক শতাব্দী সময় পৃথিবীর মানুষ নষ্ট করেছে। এই সময় যদি নষ্ট করা না হতো, সভ্যতা এগিয়ে যেতো আরো অনেক পথ।

যে-কোনো একটি দিনকে ধরে হিসেব করা যাক। একজন মানুষ কাজ করে আট ঘণ্টা, ঘুমায় আট ঘণ্টা। বাকি রইলো আরো আট ঘণ্টা। কি কি কাজ করে সে এই আট ঘণ্টায়।

খাওয়া-দাওয়া, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম, ব্যবসা বা চাকরিস্থলে আসা-যাওয়া করতে ধরুন আরো লাগে তিন ঘণ্টা–তবু অবশিষ্ট থাকে হাতে পাঁচ ঘণ্টা। এর মধ্যে কাজের আটঘণ্টা পুরোপুরি কাজ করে ব্যয় করে না সে, কাজে ফাঁকি দেয় প্রচুর। তার মানে, প্রত্যেকদিন একজন মানুষ পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টা সময় নষ্ট করছে।

সময়ের অভাব আপনি ইচ্ছা করলেই কাটিয়ে উঠতে পারেন এর অভাব ঘোচাবার একমাত্র উপায় সময়ের বাজেট করা।

জ্ঞানের অভাব–এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

স্কুল-কলেজে না পড়েও জ্ঞান অর্জন করা যায়। আপনার কি গল্পের বই, প্রবন্ধের বই, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, বিজ্ঞানের বই পড়বার অভ্যাস আছে?

থাকলে, খুবই আনন্দের কথা। বই পড়ার অভ্যাসটা আসলে অত্যন্ত উপকারী। জ্ঞান অর্জন করার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হচ্ছে, বই পড়া।

বই পড়তে খুব একটা খরচ হয় না। অসংখ্য লাইব্রেরী আছে সবখানে। পাঠ করে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করা যায় এমন পুরানো বই

পথেঘাটে প্রচুর কিনতে পাওয়া যায় সস্তা দরে। বই ধার করাও সম্ভব। এমনকি বই ভাড়াতেও পাওয়া যাচ্ছে অনেক জায়গায়।

জ্ঞান এমন একটা জিনিস যা একবার অর্জিত হলে তা আর আপনার কাছ থেকে পালাতে পারবে না কোনোদিন। আপনার জ্ঞান কেউ কেড়ে নিতে পারে না, কেউ চুরি করতে পারে না।

নিয়ম করে পড়ুন। ঠিক করুন কতোটা সময় পড়ার পিছনে ব্যয় করবেন। পড়ার অভ্যাস একবার গড়ে উঠলে কাপড়-চোপড় পরার মতো সহজ একটা ব্যাপার বলে মনে হবে পড়াটাকে।

যা পড়বেন, অর্থ বুঝে পড়বেন। প্রথমে ধীরে ধীরে পড়ার অভ্যাস করুন। একবার পড়ে না বুঝলে আবার পড়ুন, বারবার পড়ুন। অর্থ না বুঝে সামনের পাতায় চোখ রাখবেন না।

এবার-অভিজ্ঞতা।

অভিজ্ঞতা কাকে বলে তা আপনার জানা দরকার।

জ্ঞানের সাথে অভিজ্ঞতার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। জ্ঞানকে যাচাই করার নাম অভিজ্ঞতা।

এমনিতে জ্ঞানের বিশেষ কোনো মূল্য নেই, যাচাই করার পরই তার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব। বেচাকেনা করার পদ্ধতি শেখা খুব একটা কঠিন নয়, কিন্তু শেখা জ্ঞানটাকে কাজে লাগাতে হলে অভিজ্ঞতার দরকার হয়।

কাজে হাত দিন, কাজে নামুন, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দুটোই অর্জন করবেন, যে বিষয়ে জ্ঞানার্জনের গভীর আগ্রহ রয়েছে আপনার মধ্যে, সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে অবসর সময়টাকে কাজে লাগান।

সর্বশেষ আলোচ্য বিষয়টি হলো-আলস্য।

নিষ্ক্রিয়তার মতোই, কুঁড়েমি বা আলস্য কোনো কারণ নয়-ফলাফল। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, কেন আমি অলস?

নিজের সাথে কারচুপি না করলে সঠিক উত্তরটি আপনি পেয়ে যাবেন। হয়তো উত্তরটি হবে, আমি তৃপ্ত, তাই অলস।

আসলে যে আপনি তৃপ্ত নন, অতৃপ্তিকে দমিয়ে রেখেছেন কোনো

না কোনো কারণে তা তো এর আগেই বলেছি। সুতরাং উত্তরটি সঠিক হলেও, ধারণাটা ভুল। ভুল ধারণা ত্যাগ করুন।

পছন্দসই, মনের মতো কাজ বেছে নিতে হবে আপনাকে। যে কাজ করতে ভালো লাগে সে-কাজে আলস্য নেই।

কুঁড়েমির হাত থেকে রেহাই পেতে হলে আগে ঠিক করুন কোন্ ধরনের কাজ আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

প্রিয় কাজ পাবার চেষ্টা করুন। কুঁড়েমির কবল থেকে রক্ষা পাবেন।

ধারাবাহিকতা

প্রখ্যাত এক জার্মান কবি বলেছেন, 'যে সামনের দিকে এগোচ্ছে না সে আসলে পিছনে সরে যাচ্ছে।'

কেউ কি পিছিয়ে থাকতে চায়? যদি কেউ চায়, তাকে আমি একটি পরামর্শ দিতে পারি—কাজ না করে হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকুন, তাহলেই নিশ্চিন্তে পিছিয়ে যেতে পারবেন।

মানুষ কাজ করে। কেন করে? আসলে দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে মানুষ। দুটোই ফলপ্রসূ, কিন্তু দুটো দু'রকম দু'জাতের ফল দেয়।

অধিকাংশ মানুষ কাজ করে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। তাদের উদ্দেশ্য টিকে থাকা।

কাজ করার আর এক উদ্দেশ্য হলো, এগিয়ে যাওয়া অর্থাৎ সমৃদ্ধি অর্জন করা। খুবই স্বল্পসংখ্যক মানুষ এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে।

কাজ না করলে মানুষ পিছিয়ে যায়, একথা আগেই বলেছি। এখন

ওই কথার সাথে যোগ করে আর একটা কথা বলতে চাই, তা হলো, শুধুমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যে মানুষ কাজ করে সে-ও আসলে পিছিয়ে থাকে

কাজ কেন করবেন, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

শুধুমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে খুব বেশি কাজ করার দরকার হয় না। ছোটো একটা সংসার আপনার, অল্প সময় কাজ করে যা রোজগার করেন, মোটা ভাত খেয়ে মোটা কাপড় পরে দিন কাটাচ্ছেন–আরো বেশি কাজ করবার দরকার কি আপনার?

যে-লোক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কাজ করে সে মনে করে, স্থিতিশীল একটা পর্যায়ে অবস্থান করছে সে। আসলে তার এই মনে করাটা সম্পূর্ণ ভুল। সে নিজেকে স্থির হয়ে আছে ভাবলে ভুলই করবে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো কিছুই স্থির হয়ে নেই। নদী, বাতাস, নক্ষত্র, এমন কি বৃক্ষ–কেউ স্থির নয়, সবাই, সবকিছু এগিয়ে চলেছে। যে এগিয়ে যায় না সে পিছিয়ে থাকে। কাজ না করে বসে থাকা মানে এই নয় যে আপনি নির্দিষ্ট এক জায়গায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে আছেন, আসলে আপনি পিছিয়ে যাচ্ছেন। আপনাকে পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছে মহাকাল যারা কাজ করছে তারা আপনাকে পিছনে রেখে ছুটে চলেছে সামনের দিকে।

অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় কাজ করা। কিন্তু এগিয়ে যাবার উপায় কি?

এগিয়ে যাওয়ারও নির্দিষ্ট উপায় আছে।

এগিয়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট উপায় হলো একটির পর একটি কাজ করা। শুধু একটি কাজ নয়, একটির পর একটি কাজ করলে এগিয়ে যেতে পারবেন আপনি।

একটি কাজ ধরলেন। শেষ হলো সেটা। কিন্তু তারপর? চুপচাপ বসে থাকতে চান নাকি?

চুপচাপ বসে থাকা মানে তো পিছিয়ে পড়া। পিছিয়ে তো আপনি পড়তে চান না। তা যদি না চান, এগিয়ে যাবার নিয়ম পালন করতে

হবে আপনাকে। নিয়মটা হলো: কাজের পর কাজ, একের পর এক কাজ করে যাওয়া।

একটা কাজ শেষ করুন, তারপর আর একটা কাজ ধরুন। কাজের পর আবার কাজে হাত দিন। যদি এগিয়ে যেতে চান, ভুলেও কক্ষনো প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন না।

কাজকে গ্রহণ করবেন আনন্দের উৎস হিসেবে। কাজের প্রতি ভালবাসা থাকা চাই, তবেই না গভীর মনোযোগ আনতে পারবেন। কাজকে কষ্টকর ব্যাপার বলে মনে করবেন না। কাজ কষ্টকর, একথা সত্যি। কিন্তু কাজ তেমনি সুফলদায়কও বটে। কি না দেয় কাজ আপনাকে? গাড়ি, বাড়ি, সয়-সম্পত্তি, মর্যাদা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব, সামাজিক সম্মান, ব্যক্তিত্ব, পারিবারিক মর্যাদা, প্রশংসা, খ্যাতি–এমন কিছু তো দেখি না যা মানুষকে দিতে পারে না কাজ। যে কাজ সম্ভাব্য সবকিছু দেয় তা করতে কষ্ট হয় নাকি আবার?

কষ্ট মনে করলে, কষ্ট তো রসগোল্লা খেতেও হয়। দোকান থেকে কিনে নিয়ে যাবেন বাড়িতে, বাক্স থেকে খুলবেন, প্লেটে সাজাবেন, হাত মুখ ধুয়ে এসে বসবেন, তারপর হাত দিয়ে তুলে মুখের ভিতর পুরবেন, চিবাবেন। কষ্টকর বৈকি। কিন্তু তবু রসগোল্লা খাওয়াটাকে কেউ কষ্টকর বলে মনে করে না।

রসগোল্লা খাওয়াটা যদি কষ্টকর কাজ না হয়, সমৃদ্ধি অর্জন করাটা কষ্টকর কাজ হতে যাবে কেন? এটা তো আনন্দের কাজ

কাজকে আপনার সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য বলে মনে করতে হবে। এমন একটা মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে যার ফলে নিজেকে কাজ করতে বাধ্য করার দরকার পড়বে না। কাজ করাটা আপনার জন্যে হবে একটা শখ, একটা মজার ব্যাপার কাজ করে মজা পেতে হবে। তা পেতে হলে প্রয়োজন মনে করে নয়, ভালবাসি মনে করে কাজ করতে হবে।

একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন, আপনার করার মতো কাজ

অনেকগুলো রয়েছে। সিদ্ধান্ত নিলেন, অমুক কাজটা ধরবো।

ধরলেনও।

কিন্তু কাজটা ধরে খানিক দূর করে কিছু বাধাবিঘ্ন দেখতে পেলেন আপনি। ফলে সেটা বাদ দিয়ে অন্য একটি কাজ ধরলেন আবার। এই দ্বিতীয় কাজটির বেলাতেও কিছু বাধার সৃষ্টি হলো, আপনি সেই বাধাগুলোকে টপকাবার চেষ্টা না করে এরপর ধরলেন তৃতীয় কাজটিকে। ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে? ধরছেন বটে আপনি, কিন্তু একটা কাজও শেষ করতে পারছেন না।

এ থেকে প্রমাণ হয়ে গেল বাধাগুলোকে আপনি ভয় পাচ্ছেন। কেন, জানেন? কাজের প্রতি আপনার ভালবাসা নেই, তাই।

কাজের প্রতি ভালবাসা থাকলে বাধাগুলোকে চ্যালেঞ্জ বলে মনে করতেন, ওগুলোকে জয় করবার জন্যে উদ্যমী হয়ে উঠতেন, বাধাগুলোকে অপসারণ করার মধ্যে প্রচুর মজা পাবার কথা আপনার, নৈরাশ্য বা বিরক্তি বোধ করার কথা নয়।

কাজ ধরেও শেষ করতে না পারার আরো একটা কারণ হলো, পরিকল্পনার অভাব। শুধু তাই নয়, পরিকল্পনার অভাব কাজের প্রতি মানুষের অহেতুক আতঙ্কেরও সৃষ্টি করে।

পরিকল্পনার অর্থ অনেক। তার মধ্যে একটি হলো, প্রস্তুতি।

প্রস্তুতি না থাকলে কাজের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও, কাজটি শেষ করতে আপনি ব্যর্থ হবেন। সুতরাং প্রতিটি কাজ শুরু করার আগে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে আপনাকে। অনেক সময় দেখা যায় কাজের প্রতি উৎসাহ এবং ভালবাসা আছে বটে কিন্তু প্রস্তুতির অভাব থাকায় কাজটি কোনদিনই শেষ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং, প্রতিটি কাজ শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে আপনাকে।

স্থির হলো, প্রস্তুতি নিতেই হবে। কিন্তু কিসের জন্যে আপনার এই প্রস্তুতি? কেউ যদি আপনাকে হুট করে প্রস্তুত হতে বলে আপনি কি প্রস্তুত হতে পারবেন? পারবেন না। কেন প্রস্তুত হতে হবে, প্রস্তুতি

কিসের জন্যে তা আপনাকে জানতে হবে প্রথমে, তাই না?

প্রস্তুতি নেবার আগে আপনাকে জানতে হবে কি সেই জিনিস যা আপনি চান। অর্থাৎ কাম্যবস্তু বা অবজেকটিভ নির্দিষ্ট করতে হবে আপনাকে।

পাঠক, আপনি হয়তো ভাবছেন, উপরিউক্ত কথাটি আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি না, কারণ, কাম্যবস্তু তো আপনার নির্দিষ্ট করাই আছে। কিন্তু আসলে কি তাই? সত্যিই কি আপনি নিজের কাম্যবস্তু নির্দিষ্ট করে রেখেছেন? আপনি জানেন আপনি কি চান?

অধিকাংশ মানুষ মনে করে তারা জানে তারা কি চায়। আসলে তাদের এই জানাটা সঠিক জানা নয়। প্রশ্ন করে দেখা গেছে তাদের নিজেদের ধারণা পরিষ্কার নয় ঠিক কি চায় তারা।

ধরুন, আপনার কাম্যবস্তু বা অবজেকটিভ হলো, রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভ করা।

একজন রাজনৈতিক নেতা কাকে বলে, বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্য কি, কোন্‌টা গ্রহণ করবেন আপনি, নেতার করণীয় কাজ কি, কর্তব্য কি, কি কি নিয়ম তাঁকে পালন করতে হয়, কি ধরনের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে থাকে, তাঁর আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক, চলন-বলন কি রকম হওয়া উচিত এবং অন্যান্য গুণ কি থাকা বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি যদি আপনার ভালোমত জানা না থাকে, তাহলে বলা যায় কাম্যবস্তু বা অবজেকটিভ সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা নেই।

যা হতে চান তা হবার পর কি করবেন, কি করার জন্যে হবেন, কিভাবে কি করার নিয়ম–এ আপনাকে জানতেই হবে। নেতা কাকে বলে তাই যদি পরিষ্কারভাবে না জানেন, কি দরকার আপনার তা হয়ে? দরকারও নেই, তা হবার অধিকারও নেই আপনার। কাম্যবস্তু নির্ধারণ বা নির্দিষ্ট করার সময় একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলবো আমি আপনাকে, তা হলো, কাম্যবস্তু অর্জনের লাইসেন্স আপনি তখনই পেতে পারেন যখন কাম্যবস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ, পরিষ্কার ধারণা আসবে আপনার মধ্যে।

ধরুন, আপনি নিজের একটা ব্যবসা চান। বেশ, ভালো কথা।

এখন বলুন, কি ধরনের ব্যবসা করতে চান আপনি? ব্যবসা তো অনেক রকমেরই আছে–ম্যানুফ্যাকচারিং, হোলসেল, রিটেইল, মেইল অর্ডার, না ইনডেন্টিং। কোন্ ধরনের ব্যবসা করতে চাইছেন আপনি? যে ব্যবসা করতে চান কল্পনায় নিজেকে সেই ব্যবসা করতে দেখতে পান কি?

বেন সুইটল্যাণ্ড একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, 'এক ভদ্রমহিলা এই প্রসঙ্গে আলোচনার সময় আমাকে বলেন, "আমার অবজেকটিভ ঠিক আছে। লেখিকা হতে চাই আমি।" '

'কি ধরনের লেখিকা হতে চান?'

আমার প্রশ্ন শুনে ভদ্রমহিলা বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। তাঁকে আমি জানাই, লেখিকা অনেক রকম হয়, কেউ গল্প লেখে, কেউ প্রবন্ধ লেখে, কেউ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে লেখে, কেউ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে পুঁজি করে লেখিকা হয়, কেউ অনুবাদক, সংবাদপত্রের মহিলা রিপোর্টারদেরকেও লেখিকা বলা হয়, কেউ ভ্রমণ কাহিনী লেখে। এরা সবাই লেখিকা কিন্তু প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বিষয়ের লেখিকা। আমার কথা শুনে ভদ্রমহিলা বুঝতে পারেন, অবজেকটিভের অংশবিশেষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা আছে, গোটাটা সম্পর্কে ধারণা নেই। এই ভদ্রমহিলার অবস্থা ছিলো সেই খেলোয়াড়ের মতো, যে জানতো সে মাঠে প্রবেশ করবে কিন্তু মাঠে সে কি খেলায় অংশগ্রহণ করবে তা জানতো না।

ভালো একটা চাকরি খুঁজছেন আপনি। ঠিক করুন কি ধরনের চাকরি চান। যে ধরনের কাজ আপনার কাছে প্রিয়, করতে ভালো লাগে সেই ধরনের কাজ করার সুযোগ আছে যে চাকরিতে সে চাকরি খুঁজুন।

চাকরির জন্যে কোনো কোম্পানির কর্মকর্তার কাছে গেলেন বললেন, 'যে-কোনো একটা চাকরি দিন, আমি করবো।' কর্মকর্তা আপনাকে চাকরি দেবেন বলে মনে হয় না। কারণ, বুদ্ধিমান

কর্মকর্তারা চান সেই ধরনের লোক যারা জানে তারা কি ধরনের কাজে পটু বা কি ধরনের কাজ তাদের কাছে প্রিয় বা পছন্দ।

নিজের একটি বাড়ি, এই যদি হয় আপনার অবজেকটিভ তাহলে সর্বপ্রথম স্থির করুন কি ধরনের বাড়ি চান, কতোটা জায়গা জুড়ে হবে বাড়িটা, আশপাশে কি থাকবে, বাড়ির ভিতর বাগান থাকবে কিনা, রুমের সংখ্যা ক'টা হবে, একতলা না বহুতলা, কোন্ এলাকায় চান বাড়িটা?

বাধাবিঘ্ন

গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করতে চান আপনি? যদি চান, বাধা আপনি পাবেনই

বাধাগুলোকে আমরা সাধারণত বিরূপ চোখে দেখে অভ্যস্ত। এটা একটা অবৈজ্ঞানিক বদভ্যাস। বাধা যেখানে নেই সেখানে উত্তরণ নেই, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। বাধাগুলোকে আমরা আসলে সঠিকভাবে চিনতে ভুল করি বলে ওগুলোকে খারাপ চোখে দেখি। আসলে, বাধাগুলোই কিন্তু আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায়

বাধা টপকানো মানে এগিয়ে যাওয়া, তাই নয় কি? বাধা আছে বলেই না সেটাকে জয় করার, টপকাবার উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন পড়ছে। বাধা না থাকলে কি হতো, ভাবুন একবার! আপনি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতেন। উত্তরণ ঘটতো না আপনার, এগোতে পারতেন না।

বাধা আসলে প্রয়োজনীয়। এই বাধাগুলোকে এক এক করে জয় করেই আপনি আপনার কাম্যবস্তুর দিকে ধীরে ধীরে এগোবেন।

বাধাগুলোকে জয় করার আগে আপনার প্রথম কাজ হলো সেগুলোকে চেনা। প্রথমে একটি বাধাকে ধরুন। ওটার ভাবগতিক বুঝুন, আকার-আয়তন পরিমাপ করুন, ওর স্বভাব-প্রকৃতি অনুধাবন করুন। একটা বাধাকে একবার চেনা হয়ে গেলে সেটাকে অতিক্রম বা জয় করা তেমন কঠিন হবে না। অপর দিকে, বাধা সম্পর্কে আপনার

যদি কোনো ধারণা না থাকে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সেগুলো আপনার সামনে আবির্ভূত হবে, ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য করবে আপনাকে।

বাধাগুলোকে একে একে চিনে নিন। তারপর খাতা পেন্সিল সাথে নিয়ে বসুন। ক্রমিক নাম্বার দিয়ে এক এক করে লিখুন বাধাগুলোর নাম। তালিকা তৈরি করুন। তালিকা হবে দুটো। একটা সম্ভাব্য বাধার তালিকা, আর একটা প্রত্যক্ষ বাধা তালিকা।

তালিকা দুটো তৈরি হয়ে গেলে বসুন এবার বিশ্লেষণে। একটা একটা করে বাধাকে ধরুন, চিন্তা করে বের করুন কিভাবে ওই বিশেষ বাধাটিকে অতিক্রম করা যায়। এই ভাবে প্রত্যেকটি বাধাকে অতিক্রম করার উপায় বের করুন।

তারপর তৈরি করুন কাজের পরিকল্পনা।

আপনার পরিকল্পনা তৈরি করার মূলনীতি হবে–একটা কাজ ধরবেন, সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকবেন, সেটা শেষ না করে দ্বিতীয় কাজে হাত দেবেন না। এইভাবে কাজ করতে একবার অভ্যস্ত হয়ে উঠলে কাজের ধারাবাহিকতা অটুট রাখতে কোনো অসুবিধা হবে না আপনার। এবং কাজে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখলে কাম্যবস্তুর অধিকারী না হবার কোনোই কারণ নেই আপনার।

উপাদান

প্রশ্ন করি, কাম্যবস্তু কি?

সকল বস্তুর উপাদান অণু বা অ্যাটম, এ আমরা জানি। যদিও আমাদের বর্তমান আলোচনায় অণুর মতো ছোটো কোনো জিনিসের দিকে মনোযোগ দেবার দরকার নেই, তবু আপনাকে জানিয়ে দেয়া উচিত বলে মনে করছি যে আপনার কাম্যবস্তু নানাপ্রকার জিনিসের সমষ্টিমাত্র। আপনার কাম্যবস্তুতে বিভিন্ন উপাদান রয়েছে।

অনেকে অনেক বস্তু বা বিষয় কামনা করে, কিন্তু পায় মাত্র অল্প কয়েকজন। এর কারণ কি জানেন? কারণ হলো বেশিরভাগ লোক

তাদের কাম্যবস্তুকে একটা ইউনিট হিসেবে গ্রহণ করে। তারা জানে না বা জানতে চায় না যে কাম্যবস্তুটি আসলে একক পদার্থ দিয়ে তৈরি নয়, ওটা বহু উপাদানের সমষ্টি, একত্রিত রূপমাত্র।

আপনি ব্যবসা করতে চান। এটা আপনার একটা কাম্যবস্তু। ব্যবসা করতে অভিজ্ঞতা, টাকা, দোকান, কারখানা বা অফিস লাগে–এইরকম আরো অনেক কিছু লাগে। এগুলো হলো আপনার ব্যবসার অর্থাৎ আপনার কাম্যবস্তুর উপাদান।

একটা উদাহরণ দেয়া যাক।

এনাম অর্থহীন জীবনযাপন করে। ছোটো একটা চাকরি করে যা রোজগার করে তাতে তার সংসার ভালো ভাবে চলে না। নোংরা এলাকায় ছোট্ট একটা ভাড়াটে বাড়িতে দীর্ঘকাল ধরে বাস করছে সে। দেনায় ডুবে আছে, সঞ্চয়ের কৌটা শূন্য।

এনামের বন্ধু মতিন। মতিনের অবস্থা এনামের ঠিক উল্টো। মতিনের প্রচুর টাকা সয়-সম্পত্তি আছে। সুন্দর বাগানসহ চমৎকার একটি বাড়ির মালিক সে। গাড়ি কিনেছে। বাড়িতে চাকর-চাকরানী রাখে। কোনো দেনা তো নেই-ই, সঞ্চয় রয়েছে প্রচুর। আরাম-আয়েসের সব রকম উপকরণ উপভোগ করে সে।

এনাম মতিনকে হিংসা করে এবং মনে মনে সে ভাবে 'মতিনের মতো অবস্থা যদি আমারও হতো!'

মতিনের সুখ এবং প্রাচুর্য দেখতে পাচ্ছে এনাম, ঈর্ষান্বিত হচ্ছে সে এই কারণেই। মতিনের বর্তমান অবস্থাটাই শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছে সে। মতিনের মতো অবস্থায় সে উঠতে চাইলেও সে জানে না যে মতিনকে বর্তমান অবস্থায় পৌছুতে কি কি নিয়ম কানুনের ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে।

নিয়ম কানুনগুলো জানা নেই এনামের। জানা থাকলে সে-ও ইচ্ছে করলে পারবে মতিনের অবস্থায় উঠে আসতে।

এনামের কাম্যবস্তু বা অবজেকটিভ রয়েছে। তার কাম্যবস্তু: সে মতিনের মতো অবস্থায় উঠতে চায়।

কিন্তু নিজের কাম্যবস্তুর উপাদান সম্পর্কে এনামের কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই।

মতিনের কাম্যবস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা যাক এবার। প্রথমেই আমরা খোঁজ নিয়ে জানছি যে মতিনের এখন যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, এই অবস্থা প্রথম দিকে তার ছিলো না। বর্তমানে এনাম যে দুরবস্থায় আছে, মতিনও এক সময় সেই দুরবস্থায় ছিলো। কিন্তু তার দুরবস্থাকে সে মেনে নেয়নি। মেনে তো নেয়ইনি, সে নিজের কাছে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল কেউ যদি জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে, আমিও পারবো, আমাকেও পারতে হবে।

মতিন নিজের মধ্যে গড়ে তুলেছিল গঠনমূলক অতৃপ্তি বোধ।

কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে একত্রে একটা ব্যবসায়ে নামে মতিন। ব্যবসা করতে গিয়ে প্রথম প্রথম অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয় সে, মার খায় বেশ ক'বার। কিন্তু মুষড়ে পড়েনি বা নৈরাশ্যে হাবুডুবু খায়নি সে কখনো, নেতিবাচক চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়নি, কাজের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হতে দেয়নি, নিজেকে ভুলেও অযোগ্য বলে চিহ্নিত করেনি।

মতিনের কারখানায় যা তৈরি হতো তা প্রথম প্রথম বিক্রি হতো স্থানীয়ভাবে। জিনিসের গুণ এবং মান ভালো হওয়ায় জেলাভিত্তিক বাজার পেলো মতিন। এখন গোটা দেশব্যাপী তার তৈরি জিনিস বিক্রি হচ্ছে।

সাফল্য অর্জনের জন্যে মতিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে কিন্তু শুধুই কি পরিশ্রম? না, শুধু পরিশ্রম করলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গাধার মতো খাটলে সাফল্য আসে না পরিশ্রমের পিছনে উদ্দেশ্য (অবজেকটিভ) থাকতে হয়। উদ্দেশ্যটাকে ভাগ করে নিয়ে (উপাদান বিভক্তিকরণ এবং সংযুক্তকরণ, পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) একটা একটা করে অর্জন করতে হয়। মতিন এইসব নিয়ম পালন করেছিল, জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, তাই সে জীবনে সাফল্য লাভ করেছে।

মনোভাব! মনোভাব!

মনোভাবটাই হলো আসল কথা। জীবন সম্পর্কে আপনার মনোভাব কি রকম? কখনো ভেবে দেখেছেন? জীবন, এই পৃথিবী, বর্তমান সভ্যতা, আপনার পারিপার্শ্বিকতা–এগুলোকে আপনি কি ভালোবাসেন?

পৃথিবী মোটেই খুব একটা সুবিধের জায়গা নয়, এখানে কোনো কিছুই ঠিকঠাক মতো চলছে না–একথা সত্যি। কিন্তু যেহেতু আপনি জন্মেছেন এই ভালোয় মন্দতে মেশানো পৃথিবীতে, এবং একবার জন্মালে মরতে ইচ্ছা করে না, সেই হেতু মৃত্যু অনিবার্য না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে তো এই পৃথিবীতেই বসবাস করতে হবে। পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করার জন্যে হাজার হাজার মানুষ অক্লান্ত খাটছে, এ-ও তো আপনি মানবেন, তাই না? এবং, দেখা যাচ্ছে, কেউ যদি সঠিক অর্থে সততা বজায় রেখে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে চায় তা সে ঘটাতে পারে, অর্থাৎ এই অসুবিধাবহুল পৃথিবীতে সে পারে নিজের আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা করতে, জীবনটাকে আনন্দদায়ক এবং সুখের করে তুলতে; প্রাচুর্য, নেতৃত্ব, মর্যাদার অধিকারী হতে। পারে সে নিজেকে সুখী করতে। সুতরাং, জীবনকে কেন ভালবাসবে না সে?

জীবনকে ভালবাসা উচিত। কথাটা আপনাকেই বলছি।

জীবনের প্রতি ভালবাসার মনোভাব সাফল্যের চাবিকাঠি। কাম্যবস্তুটাকে ভালবাসতে শিখুন। তাকে কল্পনার চোখে দেখুন। আপনাকে জানতে হবে আপনার কাম্যবস্তু কেউ তৈরি করে রাখেনি, আপনিই তাকে তৈরি করবেন। কি দিয়ে?

নানারকম উপাদান সংযোগে তৈরি করবেন আপনি আপনার কাম্যবস্তু। কাম্যবস্তুর প্রতি ভালবাসার মনোভাব উপাদান অর্জনে আপনাকে সাহায্য করবে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, 'কি কি উপাদান লাগছে?'

কাম্যবস্তু সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা থাকলে কি কি উপাদান দরকার তা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

এখন, এক এক করে লিখে ফেলুন খাতায় উপাদানগুলোর নাম। তালিকা বড় হয়ে যাবার ভয় যেন পেয়ে না বসে আপনাকে। উপাদানের সংখ্যা বেশি হওয়া শুভ লক্ষণ। এতে প্রমাণ হয়, তৈরি করার মাধ্যমে কাম্যবস্তু অর্জনের কাজে আপনি নিবেদিতপ্রাণ, কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন না বা ভেজাল মিশাচ্ছেন না।

আপনি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে চান। এটা আপনার একটা কাম্যবস্তু হতে পারে। আপনার এই বিশেষ চাহিদার উপাদান কি কি?

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এমন কোনো জিনিস নয় যে একদল লোকের মধ্যে তা থাকবে আর একদল লোকের মধ্যে তা থাকবে না। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে-কেউ হতে পারে।

চরিত্রের বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের সমষ্টির ফলাফল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। সেগুলো কি কি?

সেগুলো: বন্ধু বাৎসল্য, উদারতা, মুক্তবুদ্ধি, সহানুভূতি, কর্তব্যবোধ, আনন্দমুখরতা ইত্যাদি। এগুলোই আপনার উপাদান, এক এক করে সংগ্রহ করে নিন। তৈরি হয়ে যাবে আপনার মধ্যে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

বিভক্তিকরণ এবং সংযুক্তকরণ

আমাদের কাম্যবস্তুকে যখন আমরা এককভাবে দেখি তখন সেটা সংযুক্ত। সংযুক্ত বা একক কাম্যবস্তুকে কিভাবে বিভক্ত ও বিশ্লেষণ করতে হয় সেই পদ্ধতি শিখতে যাচ্ছেন আপনি এই নতুন পরিচ্ছেদে।

সংযুক্ত এবং বিভক্ত কাম্যবস্তু কাকে বলে? একটা উদাহরণ দিয়ে

উত্তরটা দেবার চেষ্টা করছি।

ধরুন, একটি হাতঘড়ি। ঘড়িটি যেমন (সংযুক্ত) সেটিকে সেভাবে না দেখে আমরা ঘড়িটির ছোটবড় অসংখ্য সব অংশগুলোকে বিবেচনা করবো (বিভক্ত)।

বিন্দু বিন্দু পানির সমষ্টি সিন্ধু। ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে তৈরি করা হয় একটি আকাশছোঁয়া প্রাসাদ। মাইলের পর মাইল অতিক্রম করলে ঢাকা থেকে দিল্লী পৌঁছানো যায়। যে-কোনো বস্তু বা বিষয়কে আপনি দু'ভাবে দেখতে পারেন। একটি তার সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিণত রূপ, অপরটি খণ্ড খণ্ড, টুকরো টুকরো চেহারা।

গোটা একটা জিনিসকে চিন্তা করা, আর তাকে টুকরো টুকরো, আলাদা আলাদা করে চিন্তা করার মধ্যে পার্থক্য আছে।

ধরুন, আপনি একটা বাড়ি তৈরি করতে চান। আপনার মনে, আর কিছু নয়, যদি বাড়িটার স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপটাই সর্বক্ষণ স্থান পায় তাহলে বাড়ি তৈরি করার কাজটা এমন বিরাট এবং অসম্ভব বলে মনে হবে যে কাজে হাত দেবার সাহসই আপনার মধ্যে আসবে না। অথচ একটার উপর একটা ইঁট স্থাপন করা খুবই সহজ কাজ। সেই ইঁটটার উপর আর একটা ইঁট চড়ানো, এও জলবৎ তরলং। এইভাবে একটা একটা করে আপনি যদি ইঁটের উপর ইঁট গাঁথতে থাকেন, একটা পাঁচিল তৈরি হতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

আপনার কাম্যবস্তুকে দু'রকম দৃষ্টিতে এখন থেকে দেখবেন আপনি। এক, কাম্যবস্তুর স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপটা দেখুন বা চিন্তা করুন। দুই, আপনার কাম্যবস্তুকে দেখুন কয়েক ভাগে ভাগ করে, বিভক্ত অবস্থায়।

এই পদ্ধতিতে দেখা বা চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, নিজেকে যোগ্য, পারদর্শী এবং দক্ষ বলে মনে হবে।

একটা বইয়ের কথা ধরুন।

দু'হাজার পাতার একটি বই দশ ইঞ্চি ইঁটের মতো দেখতে। বইটা দেখে আপনি ভাবতে পারেন, 'ইস্! এতো বড় বই লেখা চাট্টিখানি

কথা নয়! কী অমানুষিক পরিশ্রমই না করেছেন লেখক। আমার দ্বারা এইরকম একটা বই লেখা কক্ষনো সম্ভব নয়।'

আপনার সাথে একমত হতে পারবো না। বইটার লেখক পরিশ্রম করেছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন–এ আমি মানতে রাজি নই।

আচ্ছা, বলুন তো, ফুলস্কেপ কাগজের দু'পাতাব্যাপী একটা চিঠি লিখতে কি আপনার অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়? নিশ্চয়ই হয় না সারাদিনে ক'টা ওই রকম চিঠি লেখা সম্ভব আপনার পক্ষে, অমানুষিক পরিশ্রম না করে? গোটা পাঁচেক? আরো বেশি? গুড–দশটা চিঠি তাহলে, কেমন? দশটা চিঠি মানে, কুড়ি পৃষ্ঠা।

এটা একটা তথ্য। তথ্য বলছে, আপনি সারাদিনে কুড়ি পৃষ্ঠা লিখতে পারেন। কিভাবে লেখেন? কুড়ি পৃষ্ঠা কি একসাথে লেখেন? না, তা সম্ভব নয়। এক লাফে যেমন গাছের মগডালে ওঠা যায় না, তেমনি এক ঝটকায় কুড়ি পৃষ্ঠা লেখা সম্ভব নয়।

লেখক প্রথমে শব্দ লেখেন, শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে বাক্য রচনা করেন। কয়েকটি বাক্য রচনা করার পর হয় একটি প্যারাগ্রাফ। বেশ কয়েকটি প্যারাগ্রাফের সমষ্টি একটি পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদের সমষ্টি একটি বই।

আপনি এক মাসে লিখতে পারেন ছয়শো পৃষ্ঠা। ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠা সমান ছাপা বইয়ের এক পৃষ্ঠা ধরা যাক। তিন মাস যদি নিয়মিত লেখেন আপনি, আঠারোশো পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠি বের হচ্ছে আপনার হাতের কলম দিয়ে। চিঠি না লিখে আপনি একটা বইও লিখতে পারেন এই তিন মাসে।

দু'হাজার পৃষ্ঠার বই যিনি লিখেছেন তিনি তাঁর বই লেখার কাজটাকে ভাগ ভাগ করে নিয়ে নিয়মিত রোজ কিছু কিছু করে লিখেছেন। অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়নি তাঁকে।

অথচ বইটি দেখে আপনি আঁৎকে উঠে বলেছিলেন, আপনার দ্বারা ওই রকম একটা বই লেখা কক্ষনো সম্ভব নয় কেন বলেছিলেন

কথাটা বলুন তো?

বইটার সম্পূর্ণ রূপ দেখে বলেছিলেন। বইটার সম্পূর্ণ চেহারাখানা এতো বিরাট যে দেখামাত্র ভয় লাগে, বাপরে! এতো বড়! আসলে কিন্তু যতো বড় মনে হয় ততোবড় হয়েও অতোবড় নয়, যদি আপনি বইটিকে ভাগ ভাগ করে দেখে নিতে জানেন।

দেখার চোখ

সবাই আমরা দেখতে পাই, চোখ যখন আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই পর্যবেক্ষণ করে।

বলতে পারবেন, এক টাকার কাগুজে নোটের কোন্ পিঠের কোন্ খানটায় লেখা আছে ওয়ান টাকা?

পাসপোর্ট করা দরকার আপনার অফিসের সহকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাসপোর্ট অফিসটা কোথায় জানো?'

সহকারী বললো, 'কি আশ্চর্য! আপনি তো, স্যার, অফিসে আসার সময় পাসপোর্ট অফিসের পাশ দিয়েই আসেন।' এধরনের ঘটনা ঘটেনি আপনার জীবনে?

বেশিরভাগ মানুষই দেখে, কিন্তু পর্যবেক্ষণ করে না।

কেউ কেউ বাগান দেখে, কিন্তু তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বাগানে কি কি ফুল দেখলে? বলতে পারবে না সে। দুটো কারণে সে প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারলো না। এক, কি কি ফুল বাগানে আছে, লক্ষ করেনি সে। দুই, ফুল দেখে থাকলেও ফুলগুলোর নাম জানা নেই তার।

প্রমাণ হলো, এই লোক দেখে, কিন্তু দেখে শেখে না। আরো প্রমাণ হলো, এ লোক খুঁটিয়ে দেখে না।

একটা জিনিসের মূল্য বুঝতে হলে তাকে কেবল সামগ্রিক ভাবে দেখলে চলবে না, তাকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে, তার বৈশিষ্ট্য কি, ত্রুটি কি, বিশেষত্ব কি–সব লক্ষ্য করে জেনে নিতে হবে।

দেখা মানে চোখের সামনে যা কিছু আছে সে-সবের চিত্র গ্রহণ

করা। সেই চিত্রগুলোকে স্মরণের মধ্যে রেকর্ড করাকে পর্যবেক্ষণ বলা যেতে পারে। স্মরণশক্তির মধ্যে যেগুলো রেকর্ড হয়ে রইলো সেগুলো আপনার সচেতনতার অংশ বিশেষ হয়ে থাকবে।

পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। আপনার মধ্যে এই শক্তি বৃদ্ধি পেলে কাম্যবস্তু এবং আপনার মধ্যবর্তী বাধাবিঘ্নগুলোকে সহজেই পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন, আড়ালের বাধাটাকেও বহু দূর থেকে আপনি দেখতে পাবেন। তার উপর, কাম্যবস্তুর উপাদান বিভক্তিকরণেও সাহায্য পাবেন।

আপনার চিন্তাভাবনাকে গঠনমূলক করতে হলেও কোনো জিনিসকে কিংবা কোনো বিষয়কে দেখতে হবে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে।

ঘনীভূত মনোযোগ

আপনি যা দেখেন তার একটা নোট রাখা মানে পর্যবেক্ষণ করা। কনসেনট্রেশন বা ঘনীভূত মনোযোগ কাকে বলে? নির্দিষ্ট কোনো অবজেক্ট বা সাবজেক্টের উপর যদি আপনি আপনার চেতনা এবং সজ্ঞান চিন্তা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করেন, যতোক্ষণ না সাবজেক্ট বা অবজেক্টটি সম্পর্কে আপনার পুরোপুরি ধারণা হচ্ছে–এই অবস্থাকে ঘনীভূত মনোযোগ বা কনসেনট্রেশন বলা চলে।

কন্সালটিং সাইকোলজিস্টদের কাছে যতো লোক যায়, তাদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন স্বীকার করে যে চিন্তায় ভাবনায় মনোযোগ ঘনীভূত করার ক্ষমতার অভাব রয়েছে তার মধ্যে।

মনোযোগ ঘনীভূত করতে পারা একটা গুণ, কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত অলৌকিক কিছু নয়। এ গুণের অধিকারী আপনিও হতে পারেন। কথাটা ঠিকভাবে বলা হলো না, আসলে এই গুণের অধিকারী হতেই হবে আপনাকে। আপনার জন্যে এটা ফরয।

'চিন্তায় বা কাজে মন বসাতে পারি না আমি।'–এই ধরনের নেতিবাচক কথা ভাববেন না বা বলবেন না। আপনি যদি বারবার

বলেন, 'কিছুই মনে রাখতে পারি না আমি।'–দেখবেন, সত্যি সত্যি কিছুই মনে রাখতে পারছেন না। এই নিয়ম সব কিছুতে খাটছে। যা ধরে নিচ্ছেন, ফলাফল তাই ঘটছে।

হাতের কাজ সম্পর্কে বিরূপতাও ঘনীভূত মনোযোগের অভাব ঘটায়। চঞ্চল মন পালাবার চেষ্টা করতে পারে। তাই, কাজটাকে আগে পছন্দ করুন। পছন্দসই কাজে মনকে বসাতে হয় না, মনই আপনাকে বসায়।

কুঁড়েমির কারণেও ঘনীভূত মনোযোগের অভাব ঘটা বিচিত্র নয়। কিন্তু কেউ যদি আনন্দদায়ক কোনো কাজ করে, কুঁড়েমি আসতেই পারে না তার মধ্যে। এক্ষেত্রেও ওষুধ ওটাই: আনন্দ দেয় যে কাজ সেই কাজ করুন।

নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করলে কোনো কাজেই ঘনীভূত মনোযোগ প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না।

অনুশীলন

আরামদায়ক একটি চেয়ারে এমন পজিশন নিয়ে বসুন, সামনে ফাঁকা দেয়াল ছাড়া যেন আর কিছু দেখা না যায়। ছোটো একটা টুল বা টেবিল রাখুন নিজের সামনে। টেবিলের উপর রাখুন একটা বই–যে-কোনো বই। এখন আপনার একমাত্র কাজ পাঁচ মিনিটের জন্যে দুনিয়া সম্পর্কে যাবতীয় সব কথা ভুলে যান, ভুলে গিয়ে ভাবুন শুধুমাত্র বইটার কথা। বইটার দিকে তাকিয়ে বারবার, 'এটা একটা বই…এটা একটা বই…এটা একটা বই…' উচ্চারণ করার দরকার নেই। বইটা সম্পর্কে ভাবুন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে, যতোরকম ভাবে ইচ্ছা ততোরকম ভাবে। আপনি বইটার বিষয়-সূচী সম্পর্কে ভাবতে পারেন, আকার সম্পর্কে ভাবতে পারেন; রঙ, নাম, কাভার, ডিজাইন, বাঁধাই ইত্যাদি সম্পর্কে যা ইচ্ছা তাই ভাবতে পারেন। বইটা সম্পর্কে ভাববার বিষয়বস্তুর অভাব পড়বে না আপনার। আপনি যদি মুদ্রণ সম্পর্কে মোটামুটি জানেন, তাহলে মানসপটে দেখতে পারেন বইটা ছাপা

হচ্ছে। এমনকি আপনি কল্পনার চোখে দেখতে পারেন বইটা ডাকযোগে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন এজেন্টদের কাছে চলে যাচ্ছে, বিভিন্ন দোকানে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে।

এইভাবে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট বইটা সম্পর্কে চিন্তা করার পর, কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়ুন বইটা নিয়ে একটা রচনা লিখতে। বইটাকে নিয়ে রচনা লিখবেন, কিসের উপর ভিত্তি করে? পাঁচ মিনিট ধরে বইটার কথা যা ভেবেছেন, সেই ভাবনাই হবে আপনার রচনার মালমশলা।

লিখেছেন? বেশ। রেখে দিন ওটা।

পরদিন বই নয়, অন্য কোনো একটা জিনিস গ্রহণ করুন আপনার দ্বিতীয় রচনা লেখার জন্যে। আম, কাঁঠাল বা যে-কোনো একটা ফলকে বেছে নিতে পারেন। বইটার উপর যেভাবে পাঁচ মিনিট সময় খরচ করেছিলেন এই ফলটার উপরও সেই পদ্ধতিতে সময় খরচ করুন। ভাবুন, ফলটা কিভাবে জন্মালো, কিভাবে গাছ থেকে বাজারে এলো, কিভাবে বাজার থেকে আপনার বাড়িতে তসরিফ আনলো, ফলটার স্বাদ কি রকম, দেখতে কেমন, কি ভিটামিন কি পরিমাণ আছে, এই ফল বছরের কোন্ সময় ফলে—ইত্যাদি।

ফলের উপর রচনা লিখলেন, কেমন? রেখে দিন এটাও। ভালো কথা, রচনাগুলো যেন পাঁচশো শব্দের কম না হয়।

এইভাবে, সপ্তাহের সাতদিন সাতটি আলাদা আলাদা জিনিসের উপর সাতটি রচনা লিখবেন আপনি। লিখিত রচনাগুলো রেখে দিতে বলেছিলাম, আপনার সন্তুষ্টির জন্যেই। সর্বশেষ রচনাটি লেখা শেষ হলে প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় রচনাটি ড্রয়ার থেকে বের করে পড়ুন। প্রথম দিকের রচনাগুলোয় অনেক ত্রুটি পাবেন। যে-ধরনের ত্রুটি আপনার শেষ দিকের রচনাগুলোয় পাবেন না। তার মানে, শেষের দিকে উন্নতি হয়েছে আপনার। রীতিমত বিস্মিত হবেন আপনি শেষের দিকের রচনাগুলোয় আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তির উন্নত প্রকাশ দেখে। এই অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ শক্তি

অর্জন করছেন, সেই সাথে মনোযোগ ঘনীভূত করার চমৎকার কৌশলটা শিখে নিচ্ছেন। এবং বোনাসস্বরূপ, রচনা লেখকের কৃতিত্ব লাভ করছেন, নিজের চিন্তা-ভাবনাকে গুছিয়ে প্রকাশ করার কায়দাও রপ্ত হয়ে যাচ্ছে আপনার।

বৃহত্তর-ক্ষুদ্রতর

আগেই জানিয়ে দিয়েছি আপনাকে, এক সাথে নয়, এক এক করে কাম্যবস্তু অর্জন করার মধ্যেই সাফল্য নিহিত।

একবারে একটি কাম্যবস্তু অর্জন করার চেষ্টা করবেন আপনি। যখন যে কাম্যবস্তুটি অর্জন করতে চাইবেন সেটিই হবে তখন আপনার প্রধান কাম্যবস্তু, একমাত্র চাওয়া বা মেজর অবজেকটিভ।

আপনার যে-কোনো কাম্যবস্তুকে আপনি প্রধান বা বৃহত্তর কাম্যবস্তু বলে মনে করুন। বৃহত্তর কাম্যবস্তুকে এবার ভাঙতে হবে ছোটো ছোটো টুকরোয়। এই ছোটো ছোটো টুকরোগুলো আপনার ক্ষুদ্রতর কাম্যবস্তু বা মাইনর অবজেকটিভ। ক্ষুদ্রতর কাম্যবস্তুগুলোকে এরপর গুরুত্ব অনুযায়ী লিখিতভাবে সাজান। এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে এক নম্বর থেকে সর্বশেষ ক্ষুদ্রতর কাম্যবস্তু বা অবজেকটিভ এক এক করে অর্জিত হলে ফলাফল দাঁড়াবে: বৃহত্তর অবজেকটিভটি অর্জনে সাফল্য।

মনে আছে তো, এর আগে আমরা শিখেছি, আমাদের অবজেকটিভ (এখন যাকে বলবো বৃহত্তর অবজেকটিভ) সম্পর্কে পরিষ্কার এবং বিশদ ধারণা থাকতে হবে আমাদের? আমরা ঠিক কি অর্জন করতে চাই তা জানতেই হবে নিখুঁত ভাবে।

আপনার এক নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভটিকে ধরুন। যে পর্যন্ত সেটা অর্জিত না হচ্ছে, মনে করুন, সেটাই আপনার বৃহত্তর

অবজেকটিভ।

এক নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভটিই এখন পরিণত হলো আপনার বৃহত্তর অবজেকটিভে। এই বৃহত্তরে রূপান্তরিত অবজেকটিভকে বাস্তবায়িত করার আগে আপনার এবং আপনার উক্ত অবজেকটিভের মাঝখানে কি কি বাধা আছে গবেষণা করে বের করুন। বাধাগুলোকে সনাক্ত করা খুবই জরুরী। প্রত্যক্ষ এবং সম্ভাব্য বাধাবিঘ্নগুলোকে টপকাবার জন্যে একটা তৎপরতামূলক সক্রিয় কার্যপদ্ধতি স্থির করুন, তারপর রচনা করুন কাজে হাত দেবার পরিকল্পনা। এই অবজেকটিভ অর্জিত হলে এরপর ধরুন দু'নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভটিকে।

দু'নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভটিকে গ্রহণ করুন পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী বৃহত্তর অবজেকটিভ হিসেবে। এটি এখন আর আপনার কাছে ক্ষুদ্রতর থাকছে না, হয়ে দাঁড়াচ্ছে বৃহত্তর।

আসুন, উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে আরো পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাক।

ধরুন, আপনি কিছু একটা আবিষ্কার করতে চাইছেন। আবিষ্কার করার পর জিনিসটাকে আপনি নিজের কারখানায় তৈরি করে সারা দেশের মার্কেটে সাপ্লাই দেবেন–এই হলো আপনার অবজেকটিভ।

আপনি বর্তমানে কপর্দকহীন, একটা ফুটো পয়সাও নেই আপনার পকেটে।

বড় একটা কারখানার মালিক হতে গেলে রাশি রাশি টাকা লাগে। কারখানা পরিচালনা করাটাও প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। আপনার কাছে টাকা নেই। আছে শুধু একটা ইচ্ছা।

আপনার এই ইচ্ছাটাকে কি বাস্তবায়িত করা অসম্ভব? না, অসম্ভব নয়। আপনি যদি আপনার এই ইচ্ছাটাকে বৃহত্তর অবজেকটিভ বলে গ্রহণ করেন, এবং তারপর বৃহত্তর অবজেকটিভকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে অনেকগুলো ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভে পরিণত করেন, আপনার দ্বারা সাফল্য লাভ অবশ্যই সম্ভব।

আবিষ্কার না করেই মাঠে নেমেছেন আপনি। সুতরাং,

আবিষ্কারটাই হোক অনিবার্য প্রয়োজনের খাতিরে আপনার এক নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভ।

কোনো আবিষ্কারের মালিক হওয়া আপনার পক্ষে দুই ভাবে সম্ভব। হয় নিজের মাথা থেকে বের করুন আবিষ্কারটাকে, নয়তো কারো কাছ থেকে কিনে নিন। ধরা যাক, আপনার মধ্যে কিছু একটা সৃষ্টি করার তাগিদ আছে বলেই মাঠে নেমেছেন আপনি, সৃষ্টি করার আনন্দ পেতে চান বলে জিনিসটার আবিষ্কারক হতে চান নিজেই, অন্য কোনো আবিষ্কারকের আবিষ্কার কিনতে চান না। বেশ, ভালো কথা।

আমরা সবাই জানি, প্রয়োজন আবিষ্কারের উৎস বা জনক। প্রয়োজন, অর্থাৎ অভাব। একটা নির্দিষ্ট জিনিসের অভাব খুঁজে বের করুন, তারপর অভাব পূরণ করবার জন্যে নির্দিষ্ট জিনিসটি আবিষ্কার করার চেষ্টা করুন।

অলসভাবে বসে থেকে যদি চিন্তা করেন, 'কিছু একটা আবিষ্কার করতে চাই আমি।' চাওয়া পর্যন্তই, জিনিসটা আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

প্রথমেই জানতে হবে আপনাকে, কি আবিষ্কার করতে চান। নির্দিষ্ট একটা অভাব বা প্রয়োজন খুঁজে বের করুন–তারপর পূরণ করুন সেটা।

আপনার প্রথম ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভ: বাজার ঘুরে খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন বাজারে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জন্যে ছোটো তিন চাকাওয়ালা গাড়ি তেমন নেই, যেগুলো আছে সেগুলো টেকসই নয়, দেখতেও তেমন ভালো নয়, দামও গলাকাটা। এর চেয়ে ভালো জিনিস পাওয়া গেলে বাচ্চাদের অভিভাবকরা সেটাকে লুফে নেবে। আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন, বাচ্চাদের জন্যে গাড়ি তৈরি করবেন। মাথা ঘামিয়ে বা কোনো ডিজাইনারের সাহায্যে আপনার মনের মতো একটা নকশা তৈরি করুন গাড়ির। এই গাড়ির নকশা আপনার আবিষ্কার। আপনার প্রথম ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভ অর্জন করলেন আপনি। এবার দু'নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভ অর্জন করার কাজ আপনার সামনে।

নিজের কারখানায় গাড়ি উৎপাদন–এটা আপনার দু'নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভ।

নিজের একটা কারখানা গড়তে প্রচুর টাকার দরকার। টাকা আপনার নেই। উপায়?

উপায় হলো, আপনার দু'নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভটিকে আপনার এই মুহূর্তের বৃহত্তর অবজেকটিভ বলে গ্রহণ করুন, এবং তারপর আপনার এই বৃহত্তর অবজেকটিভটিকে ভেঙে কয়েকটি ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভে পরিণত করুন।

যেহেতু আপনার টাকা নেই, তাই কারখানার মালিক হওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয় আপনার পক্ষে। আপনি অন্য কোনো কারখানার মালিকের সাথে আলোচনা করুন, তার সাথে একটা ব্যবসায়িক চুক্তিতে আসুন। তার কারখানায় আপনি আপনার আবিষ্কৃত গাড়ি তৈরি করান, তৈরি করা গাড়ি বাজারে বিক্রি করুন। এতে লাভ হবে, ধীরে ধীরে টাকা জমবে আপনার। তারপর একদিন, সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, আপনি নিজে একটা কারখানার মালিক হবেন, নিজের কারখানায় তৈরি করবেন নিজের আবিষ্কৃত গাড়ি।

টুকরো বৃহত্তর সম্পর্কে

ক্লাব বা বিভিন্ন ধরনের সমাবেশে, আপনি হয়তো হীনম্মন্যতার পরিচয় দেন। নিজের পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে, সুন্দর ভাবভঙ্গি সহযোগে, চোখাচোখা যুক্তি দিয়ে বক্তৃতা করে যারা, তারা হয়তো আপনার ঈর্ষার পাত্র। আপনি হয়তো অবাক হয়ে ভাবেন, অসংখ্য শ্রোতাদের সামনে লোকটা অমন সপ্রতিভ, সহজ থাকে কিভাবে?

লোকটার মতো আপনিও চান সভা-সমাবেশে সহজ হতে, সাহসী হয়ে উঠতে, আত্মবিশ্বাসের সাথে কিছু বলতে। কিন্তু আপনি সেই সাথেই হয়তো অনুভব করেন: লোকটার মতো আমি কোনোদিনই অমন সহজ, সাবলীল, সপ্রতিভ হতে পারবো না। মঞ্চের উপর

নিজেকে আসলে আপনি কল্পনা করতেই ভয় পান।

বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর থিওরি প্রয়োগ করে আপনি এই সমস্যার সমাধান বের করতে পারেন। লোক-সমাবেশে কথা বলা কারো জন্মগত গুণ নয়, এই গুণ নিজের মধ্যে তৈরি করতে হয়। বহুলোকে এই গুণ তৈরি করছে যার যার প্রয়োজনে, আপনিও ইচ্ছে করলে এই গুণের অধিকারী হতে পারেন।

কিভাবে? বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর থিওরি প্রয়োগ করে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে আপনার এক নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভ কি? মঞ্চ ভীতির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া। এই মুহূর্তে আপনি হয়তো নিজেকে প্রশ্ন করবেন, 'আমার মধ্যে ভয় ভয় একটা ভাব রয়েছে, এর থেকে রেহাই পাবো কি ভাবে?' আপনার এই প্রশ্নের উত্তরটা এতোই সহজ যে শুনে শুধু আনন্দিতই নয়, বিস্মিতও হবেন। তার আগে, একটা প্রশ্ন করবো আপনাকে।

লোক সমাবেশে এমন একজন ব্যক্তি কি আছে যার সাথে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলতে আপনি ভয় পান? পান না–বেশ। এখন, একটা সত্য প্রকাশ করি।

মনে করুন, দুশো লোকের একটা সমাবেশে উপস্থিত রয়েছেন আপনি। সুবিধের খাতিরে ধরুন, একজন লোকের বুদ্ধি এবং বিচার ক্ষমতা এক পোয়া।

দুশো লোকের বুদ্ধি এবং বিচার ক্ষমতা তাহলে কতো? অঙ্কটা কিন্তু খুবই সহজ।

কি বললেন? দুশো লোকের বুদ্ধি এবং বিচার ক্ষমতা একমণ দশ সের?

না, অঙ্ক মেলেনি আপনার। আলাদা আলাদা ভাবে ওজন করলে দুশো লোকের বুদ্ধি এবং বিচার ক্ষমতা দুশো পোয়া অর্থাৎ একমণ দশ সেরই হয় বটে কিন্তু একটা সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে অঙ্কটা কষতে হবে। সত্যটা কি? সত্যটা হলো, দুশো কেন, দু'হাজার মানুষ একত্রিত হলেও তাদের বুদ্ধি এবং বিচার ক্ষমতা দু'হাজার গুণে উন্নীত হয় না।

দুশো লোকের একত্রিত হওয়ার মানে এই নয় যে তাদের বুদ্ধি এবং বিচার ক্ষমতা দুশো গুণ বেড়ে গেছে। আসলে ওই দুশো লোকের বুদ্ধি এবং বিচার ক্ষমতা এতোটুকু বাড়েনি, আছে সেই এক পোয়াই। অর্থাৎ এক ব্যক্তির বুদ্ধি-বিবেচনা যতোটুকু দুশো লোকেরও তাই, তার বেশি এক কণাও নয়। সুতরাং, যে-কোনো একজন লোকের সাথে যদি কথা বলতে দ্বিধা বোধ না করেন আপনি, দুশো লোকের উদ্দেশে কথা বলতে দ্বিধা বোধ করবেন কেন? একজনের সাথে কথা বলতে পারলে সকলের সাথে একযোগেও বলতে পারবেন। দুশো বা দু'হাজার লোকের সমাবেশে কথা বলবার সময় আপনি ধরে নেবেন মাত্র এক পোয়া বুদ্ধি এবং বিচার ক্ষমতার উদ্দেশে কথা বলছেন আপনি।

শ্রোতামণ্ডলীকে ভয় পাবেন না। তাদেরকে ভালবাসুন। তারা আপনার কথা শুনবে, সুতরাং তাদের জন্যে আপনার মধ্যে ভালো মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়।

কিভাবে, কোন্ পরিবেশে কোন্ ভঙ্গিতে কথা বলবেন আপনি তার উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। কথা বলার ভঙ্গি রপ্ত করা–এটা হোক আপনার দু'নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভ।

খুব দ্রুত বা খুব ধীর ভঙ্গিতে, খুব জোরে বা খুব নিচু গলায় অবশ্যই কথা বলবেন না। সুর, উচ্চারণ, শব্দচয়ন, বাক্যগঠনরীতি ইত্যাদির দিকে তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিতে হবে আপনাকে।

কণ্ঠস্বর সম্পর্কে সচেতন হোন। সচেতন থাকলেই কণ্ঠস্বরের ত্রুটি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। জোর গলায় পড়বার চেষ্টা করুন, পরীক্ষা করুন নিজের কণ্ঠস্বরটিকে কতরকমভাবে পরিবর্তন করা যায়। পরিষ্কার কণ্ঠে উচ্চারণ করুন প্রতিটি শব্দ।

আপনার তিন নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভ হতে পারে: ভাষার ত্রুটি কাটিয়ে ওঠা।

নির্ভুল ভাষায় কথা বলা শিখতে হবে আপনাকে। আপনি যদি আপনার বক্তব্য পরিষ্কার করে তুলে ধরতে চান, বড়সড় একটা শব্দের ভাণ্ডার একান্তভাবেই থাকা দরকার আপনার। মনের ভাব বা বক্তব্য

প্রকাশ করার ক্ষেত্রে শব্দের দান সবচেয়ে বেশি। চিন্তার বাহক শব্দ। আপনি যা চিন্তা করছেন তা যদি প্রকাশ করতে চান, শব্দের সাহায্যেই শুধুমাত্র তা সম্ভব। সুতরাং, নিজের মধ্যে প্রচুর শব্দের একটা ভাণ্ডার তৈরি করুন।

ঈর্ষা কেন?

নিজের যোগ্যতা ও উপযুক্ততাকে যে খাটো করে দেখে সে অপরকে ঈর্ষা করে। ঈর্ষা হলো নিজের প্রতি সন্দেহের লক্ষণ। হীনম্মন্যতার পরিচায়ক।

এনাম যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে সে-ও ইচ্ছা করলে মতিনের মতো অবস্থায় উঠতে পারে, তখন কি সে মতিনের সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষা করতো?

না।

পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে মার্কেটে গেলেন, গিয়ে দেখলেন অনেকে অনেক জিনিস কিনছে–এদের কেনাকাটা দেখে কি আপনার মধ্যে ঈর্ষাভাব জাগবে? না। কারণ, আপনিও তো কিনতে গেছেন, কিনছেন। ওরা যা কিনছে, আপনিও ইচ্ছা করলেই তা কিনতে পারেন।

আপনার বন্ধু আপনার চেয়ে ভালো বাড়িতে বসবাস করছে। আপনি যদি তার এই ভালো বাড়িতে বসবাস করাটাকে ঈর্ষার চোখে দেখেন তাহলে পরিষ্কার প্রকাশ হয়ে পড়ছে যে আপনি আপনার বন্ধুর মতো একটা ভালো বাড়ির ব্যবস্থা করার ব্যাপারে নিজের যোগ্যতাকে সন্দেহের চোখে দেখছেন।

অন্যকে, তাদের যা আছে তার জন্যে ঈর্ষা না করে, বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর থিওরি প্রয়োগ করে যে জিনিস দেখে পাবার ইচ্ছে হয় তা অর্জন করার চেষ্টা করুন।

ঈর্ষা করা মানে নিজেকে অযোগ্য বলে মেনে নেয়া। আপনার কোনো এক বন্ধুর কথা ধরুন। সে সকলের সম্মান পায়, ভালবাসা

পায়, শ্রদ্ধা পায়। তার এতো সব পাওয়া দেখে আপনি ঈর্ষাবোধ করেন। অথচ ঈর্ষাবোধ করার কোনো কারণ নেই আপনার। কারণ, সম্মান, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, প্রশংসা তার মতো, এমনকি তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আপনিও পেতে পারেন–পাবার ইচ্ছে যদি আপনার মধ্যে থাকে।

ঈর্ষাবোধকে আপনি গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করতে শিখুন। যার যে জিনিসটি দেখে আপনার মধ্যে ঈর্ষার উদ্রেক হয় সেই জিনিসটি অর্জন করার জন্যে উদ্যোগী হোন ওই জিনিসটিকেই আপনি গ্রহণ করুন আপনার কাম্যবস্তু হিসেবে। তারপর নিয়ম মেনে সেটি অর্জন করার জন্যে যা যা করা দরকার করুন। পেয়ে যাবেন জিনিসটি। আপনার মধ্যে কণা পরিমাণেও ঈর্ষাবোধ থাকবে না। জিনিসটা আপনার ছিলো না বলেই আপনি চেয়েছেন, তারপর অর্জন করে নিয়েছেন, ঈর্ষা কেন?

কিভাবে ভাগ করে এগোবেন

যে-কোনো একটি কাজ সম্পূর্ণ করতে চান আপনি। কাজটা কোত্থেকে শুরু করবেন, জানা দরকার আপনার। প্রত্যেকটি কাজের শুরু এবং শেষ আছে। যে কাজটি করবেন বলে স্থির করবেন সেই কাজটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার আপনার। একটা উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাক।

ধরুন, আপনি একটি বই ছাপতে চান।

বই ছাপার কাজটিকে এখানে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করছি বটে কিন্তু এই উদাহরণ অন্য যে-কোনো কাজের সাথে সঙ্গতি রাখবে। বই ছাপতে হলে আপনাকে যে-সব নিয়ম পালন করতে হবে সব জানিয়ে দিচ্ছি, অন্য কাজের বেলাতেও এই নিয়মগুলো প্রযোজ্য।

আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন: একটি বই ছাপবেন।

সিদ্ধান্ত নিলেন ছাপবেন, কেন সিদ্ধান্ত নিলেন? এটা একটা প্রশ্ন। কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত তখনই কেউ নেয় যখন সেই কাজটির দ্বারা

সে উপকৃত হবার সম্ভাবনা দেখে। আপনি বইটি ছাপার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? বইটা বাজারে বিক্রি করে ব্যবসা করবেন, তাই। আপনার বই ছাপার উদ্দেশ্য, ধরা যাক, টাকা রোজগার করা।

সিদ্ধান্ত নেবার আগে আপনাকে জেনে নিতে হবে অনেকগুলো প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কি বই ছাপাবেন? উপন্যাস, না প্রবন্ধের বই? গল্পের বই, না কবিতার বই? বাজারে এখন, ধরা যাক, আত্মোন্নয়নমূলক বইয়ের খুব চাহিদা। বেশ, ওই বিষয়ের উপর একটি বই ছাপবেন, স্থির হলো।

কাজে হাত দিতে যাচ্ছেন আপনি। তার আগে একটি ডেস্ক ক্যালেণ্ডার কিনুন। আজ মে মাসের এগারো তারিখ, ধরুন। ক্যালেণ্ডারের পাতায় এগারো তারিখের নিচে লিখুন: এক, লেখকের সন্ধান চাই।

আপনি যে ধরনের বই লেখাতে চান তা সব বা যে-কোনো ধরনের লেখকের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। এই বিষয়ে কয়েকজন নির্দিষ্ট লেখক আছেন। তাঁদের সাথে আপনার যোগাযোগ করতে হবে। কিন্তু তাঁদেরকে আপনি হয়তো চেনেন না। কারো হয়তো নাম জানেন, কিন্তু তাঁর বাড়ির ঠিকানা জানা নেই। কি করবেন?

(১) লেখকের সন্ধান চাই।

এটি আপনার প্রথম বৃহত্তর অবজেকটিভ। মনে করুন একটি বড় কাজ। এটি আপনার বৃহত্তর অবজেকটিভ। এই বৃহত্তর অবজেকটিভটিকে আপনি কয়েকভাগে ভাগ করে কয়েকটি ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভে রূপান্তরিত করুন। কিভাবে তা-সম্ভব?

আপনার পরিচিত প্রকাশকদের কাছে যেতে হবে আপনাকে। কয়েকজনের নাম লিখে ফেলুন নোট বইতে। এঁরা হয়তো আপনাকে লেখকের সন্ধান বা তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারবেন। বাড়ি বা অফিস থেকে এখন আপনাকে বেরুতে হবে। যেতে হবে কয়েকজন প্রকাশকের কাছে। প্রকাশকদের অফিস, ধরুন, বাংলাবাজার, বাংলাবাজারে যাওয়া কি খুব কঠিন? মোটেই নয়।

রাস্তায় নেমে একটা রিকশা নিন, পৌঁছে দেবে সে আপনাকে বাংলাবাজারে।

ক) প্রকাশকদের সাথে দেখা করুন। তাদেরকে লেখক সম্পর্কে প্রশ্ন করুন।

খ) এখন আপনার বৃহত্তর অবজেকটিভ। খোঁজ নিয়ে, ধরুন, আপনি পাঁচজন লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলেন।

গ) লেখকের কাছে যাওয়া এবং তাঁকে আপনার উদ্দেশ্যের কথা জানানো।

এটি আপনার আর একটি ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভ। এটিকে এখন আপনি বৃহত্তর অবজেকটিভ রূপে গণ্য করবেন। তারপর এটিকে কয়েকভাগে ভাগ করে ফেলে রূপান্তরিত করতে পারেন কয়েকটি ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভে।

পাঁচজন লেখকের সাথে এক এক করে, আলাদা আলাদা ভাবে দেখা করলেন আপনি। তাঁদের সাথে কথা বললেন। যাঁকে আপনার পছন্দ হলো, যিনি আপনার নির্বাচিত বিষয়ের উপর আপনার নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাণ্ডুলিপি লিখে দিতে সম্মত হলেন আপনি তাঁকে নিযুক্ত করলেন।

লেখকের সন্ধান চাই–এটি ছিলো আপনার এক নম্বর বৃহত্তর অবজেকটিভ। এই অবজেকটিভ অর্জিত হলো।

এরপর আর এক বৃহত্তর অবজেকটিভ।

(২) পাণ্ডুলিপি পড়া, সংশোধন করা, প্রেসে ছাপতে দেয়া।

দু'নম্বর বৃহত্তর অবজেকটিভ এটি আপনার। এটিকে ভাগ করতে হবে অনেকগুলো ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভে।

ক) লেখক পাণ্ডুলিপি দিলে সেটি পড়তে হবে।

খ) সংশোধনের জন্য পাঠাতে হবে আবার।

গ) সংশোধিত পাণ্ডুলিপি টেবিলে নিয়ে বসতে হবে হিসেব করার জন্যে। শব্দ গুণে স্থির করুন বইটা কতো ফর্মা হবে। হিসেব করে জেনে নিন কতো রীম কাগজ লাগবে।

ঘ) প্রেস অনেক রকম আছে। বইটা কোন্ প্রেসে ছাপবেন স্থির করে সেই শ্রেণীর প্রেসে যান। ছাপার রেট সম্পর্কে আলোচনা করুন। তাদের সাথে একটা চুক্তিতে আসুন।

ঙ) পাণ্ডুলিপি প্রেসে জমা দেবার আগে ঠিক করুন ছাপা হবার পর প্রত্যেকটি বইয়ের জন্যে খরচ পড়বে কতো। তারপর মূল্য স্থির করুন। কমিশন বাদ দিয়ে যা পাবেন তা খরচের চেয়ে বেশি হতে হবে, তবেই না লাভ করবেন বইটি ছেপে।

চ) কাভার ডিজাইন করান।

ছ) প্রেসে কাগজ দিন।

জ) প্রুফ দেখুন বা দেখান।

এখানে দেখা যাচ্ছে আটটি খণ্ড খণ্ড কাজের সমষ্টি হলো আপনার দু'নম্বর বৃহত্তর অবজেকটিভ। এই আটটি খণ্ডের প্রত্যেকটিকে আপনি বৃহত্তর অবজেকটিভ ধরতে পারেন সুবিধের জন্যে। ধরুন প্রথম খণ্ডটির কথা। ক) লেখক পাণ্ডুলিপি দিলে সেটি পড়তে হবে। পড়তে হলে সময় চাই। কাজের মানুষ আপনি, সময়ের অভাব খুব। তবু সময় বের করতেই হবে। কিভাবে সময় বের করবেন স্থির করুন। ডেস্ক ক্যালেণ্ডারে লিখুন, দুপুরের ঘুম বাদ দিয়ে পাণ্ডুলিপি পড়বো। ক যদি হয় আপনার বৃহত্তর অবজেকটিভ তাহলে 'দুপুরের ঘুম বাদ দিয়ে পাণ্ডুলিপি পড়বো'–এটি হবে আপনার ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভ। এইভাবে প্রত্যেকটি খণ্ডকে খণ্ডাংশে পরিণত করে নিতে পারেন আপনি।

ছাপার কাজ শুরু হয়েছে। বইগুলো নির্দিষ্ট একটা তারিখে ডেলিভারি পাবেন আপনি। কিন্তু কাজ এখনও অনেক বাকি।

এরপর আপনার বৃহত্তর অবজেকটিভ হবে–

(৩) বিক্রয়।

বইগুলো দ্রুত বিক্রি করে ফেলতে হবে আপনাকে। যতো তাড়াতাড়ি বিক্রি করতে পারবেন ততো তাড়াতাড়ি পুঁজিসহ লাভ উঠে আসবে আপনার। দ্রুত এবং অধিক সংখ্যক বই বিক্রি করার জন্যে এখন থেকেই একটা কার্যক্রম হাতে নিতে হবে আপনাকে।

বৃহত্তর অবজেকটিভটিকে ভাগ করুন।

ক) বিজ্ঞাপন।

খ) সংবাদপত্রে সমালোচনা বিভাগের সাহায্য নিন বইটিকে সর্ব সাধারণের কাছে পরিচিত করে তোলার জন্যে।

গ) পোস্টার ছেপে দেশের সম্ভাব্য সর্বত্র দেয়ালে দেয়ালে সাঁটার ব্যবস্থা করুন।

ঘ) বইয়ের দোকান, এজেন্ট বা ডিলারদেরকে চিঠি লিখে আপনার বইয়ের কথা জানান।

ঙ) আপনি যদি আপনার বইয়ের বিনিময়ে অন্য কোনো বই গ্রহণ করতে চান, যোগাযোগ করুন অন্য বইয়ের প্রকাশকের সাথে।

এগুলোর প্রত্যেকটিকে আপনি কাজের সুবিধের জন্যে বৃহত্তর অবজেকটিভ ধরতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটিকে ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভে পরিণত করুন ভাগ করে।

বইটা ছাপা শেষ হলো। এর আগেই আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে, কোথায় বইটি বাইণ্ডিং করাবেন।

বাইণ্ডিং করা হলে বই তুলবেন গোডাউনে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন এজেন্সী, বুক-স্টল এবং পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে আপনার বইয়ের জন্য অর্ডার আসতে শুরু করেছে।

আপনি অর্ডার মোতাবেক রেলযোগে, লঞ্চযোগে, পোস্টযোগে, রেজিস্ট্রি-যোগে, প্লেনযোগে, ট্রাকযোগে বই পাঠাতে শুরু করবেন।

প্রত্যেকটি কাজকে আলাদা আলাদা করে লিখে নিতে হবে আপনাকে। তারপর প্রত্যেকটি কাজকে বৃহত্তর অবজেকটিভ ধরে নিয়ে ভাগ করতে হবে ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভে। তারপর, কাজটাকে আরো খণ্ড খণ্ড করার জন্যে এক নম্বর ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভকে ধরতে হবে বৃহত্তর অবজেকটিভ রূপে। তারপর সেটিকে ভাগ করতে হবে ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভে, প্রয়োজন মনে করলে সর্বশেষ ক্ষুদ্রতর অবজেটিভগুলোর প্রথমটিকে আবার, প্রত্যেকবার, বৃহত্তর অবজেকটিভ রূপে গণ্য করতে পারেন। এইভাবে, লেখকের নাম জানার জন্যে

রিকশাযোগে বাংলাবাজার যাওয়া, পরিচিত প্রকাশকদের সাথে দেখা করা, তাঁদের কাছ থেকে লেখক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, রিকশা বা বাস যোগে গিয়ে লেখকের সাথে দেখা করা, তাঁকে প্রস্তাব দেয়া, তাঁর সাথে একটা চুক্তিতে পৌঁছানো, পাণ্ডুলিপির জন্য তাগাদা দেয়া, সেটা যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে আদায় করা, পাণ্ডুলিপি পড়া, সংশোধন করার জন্যে লেখকের কাছে ফেরত দেয়া, সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে আনা, হিসেব করতে বসা, বইটি কতো ফর্মা হবে, কতো সংখ্যক ছাপা হবে, খরচ পড়বে কতো, কতো দাম রাখা চলবে, কাভার ডিজাইন কি রকম হবে, কোন্ শিল্পীকে দিয়ে করাবেন, প্রেসে কাগজ দেবেন কখন, প্রুফ দেখবেন কোন্ সময়, বাইণ্ডিং করবেন কোথায়, গোডাউনে তুলবেন কবে, সাজিয়ে রাখবেন কিভাবে, অর্ডার অনুযায়ী সাপ্লাই দেবেন কি পদ্ধতিতে–ইত্যাদি আরো হাজারটা কাজকে আপনি বৃহত্তর অবজেকটিভ বলে মনে করতে পারেন, তারপর সেগুলোকে ভাগ করতে পারেন কয়েক ভাগে, ক্ষুদ্রতর অবজেকটিভে।

সব কাজ একসাথে একবারে করতে যাবেন না। প্রথমে একটা কাজকে ধরুন। ডেস্ক ক্যালেণ্ডারে লিখুন সেই কাজের নাম। নির্দিষ্ট তারিখ এবং সময়ের মধ্যে শেষ করুন সেই কাজটি। যতোক্ষণ না সেই কাজটি শেষ হচ্ছে ততোক্ষণ অন্য কাজের কথা ভাববেন না, অন্য কাজে হাত দেবেন না।

কোনো কারণে নির্দিষ্ট কাজটি নির্দিষ্ট তারিখে যদি শেষ করতে না পারেন, কি করবেন? সেটি বাদ দিয়ে অন্য কাজে হাত দেবেন?

না। তা কক্ষনো করবেন না। ডেস্ক ক্যালেণ্ডারে যে কাজটির কথা লেখা আছে সেটি আপনার বৃহত্তর অবজেকটিভ, যতো ছোটো বা নগণ্যই হোক সেই কাজ। সেটি আগে শেষ করুন। এই নগণ্য কাজটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে আপনাকে। নির্দিষ্ট তারিখে যদি শেষ করতে না পারেন, পরদিন শেষ করার চেষ্টা করুন। কাজটা পরে করবো বলে ফেলে রাখবেন না বা অন্য কাজে হাত দেবেন না। এই কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার অন্য কাজে হাত দেবার অধিকার

নেই। আগে একটি শেষ করুন, তারপর অন্য কাজে হাত দিন। অন্য কাজটিতে যখন হাত দেবেন তখন সেটিই হবে আপনার প্রধান বা বৃহত্তর অবজেকটিভ।

লেখক সম্পর্কে জানতে পরিচিতদের কাছে যাবেন। এটি করবেন মে মাসের বারো তারিখে। ওই তারিখের সবচেয়ে বড় কাজ আপনার ওইটিই–রিকশা বা বাসযোগে কিংবা পায়ে হেঁটে বাংলাবাজারে যাওয়া। এটি আপনার বৃহত্তর অবজেকটিভ মনে করতে হবে। এইভাবে প্রত্যেকটি কাজকে আপনি প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে এগোতে শুরু করুন।

যখন কোনো অবজেকটিভ অর্জন করার চেষ্টা করছেন তখন সেটিকেই আপনার বৃহত্তর অবজেকটিভ বলে মনে করতে হবে। একটি একটি করে কাজ সমাধা করুন। বিন্দু বিন্দুতে যেমন সিন্ধু হয় তেমনি খণ্ড খণ্ড অবজেকটিভের দ্বারা সম্পন্ন হবে একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টি।

অর্জিত ক্ষুদ্রতর কাম্যবস্তুর সমষ্টি বৃহত্তর কাম্যবস্তু। অর্জিত বৃহত্তর কাম্যবস্তুর সমষ্টি–ফলাফল। বই প্রকাশ করা, বাড়ি কেনা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা–এই ধরনের প্রত্যেকটি মৌলিক কাম্যবস্তু আসলে অনেকগুলো বৃহত্তর অবজেকটিভ অর্জনের ফলাফল মাত্র।

আপনার বয়স যখন আরো কম ছিলো, কর্মজীবনে প্রবেশ করার প্রথম দিকে আপনি হয়তো উন্নতমানের বিলাসবহুল জীবন যাপনের রঙিনস্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবের কঠোর কষাঘাতে দুমড়ে মুচড়ে কদাকার রূপ ধারণ করেছে বহুদিন আগেই।

আজ এই বইটি পড়ছেন। এটি যদি গভীর আগ্রহ এবং মনোযোগের সাথে আপনি পড়তে শুরু করে থাকেন, আনকোরা উদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে উঠেছেন আপনি। উন্নত মানের, উপভোগ্য জীবন যাপন করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়–এর বদলে এখন আপনি জানেন এবং ভাবছেন, উন্নত মানের সুখ সমৃদ্ধিতে ভরা সুখকর জীবন যাপন আপনার দ্বারা অনায়াসে সম্ভব।

নাকি এখনও আপনার সন্দেহ রয়েছে? ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না এই ফর্মুলা প্রয়োগ করে যে-কোনো সাফল্য অর্জন করা সম্ভব?

সন্দেহ থাকলে, আপনার প্রথম কাজ, সন্দেহ দূর করা। সন্দেহ দূর করতে হলে বইটা আবার শুরু করুন প্রথম থেকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন এমন একটিও বাজে কথা আমি বলেছি কিনা যেটার উপযুক্ত ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ দিতে অসমর্থ হয়েছি। আমার প্রতিটি বক্তব্য যদি আপনার মনে হয় সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং যুক্তিযুক্ত-কেবলমাত্র তাহলেই দূর হবে আপনার সন্দেহ।

মানুষের জীবন কি

মানুষের জীবন অসংখ্য অভ্যাসের সমষ্টি। অভ্যাসগুলো হলো উপাদান। অভ্যাস নামক উপাদানের সমষ্টি আপনার জীবন। ঘুম থেকে জাগার পর থেকে আবার ঘুমুতে যাবার আগে পর্যন্ত আপনি যা যা করেন তার প্রায় সবগুলোরই ভিত্তি হলো অভ্যাস। আপনি সাফল্যের পথে একজন নবাগত যাত্রী, বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করতে যাচ্ছেন। নিজেকে অবশ্যই তৈরি করতে হবে আপনার। নতুন এবং উন্নতমানের জীবনের অধিকার লাভ করার জন্যে।

নিজেকে তৈরি করাটা গুরুত্বপূর্ণ। এক কোটি টাকা পেলে কি করবেন তা যদি পরিষ্কার জানা না থাকে আপনার, টাকাটা পেলে হয় আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, নয়তো পাঁচ ভূতকে লুটে নিতে সুযোগ করে দেবেন।

সাফল্য লাভের চাবিকাঠি রয়েছে আপনারই হাতে। এখন আপনি জানেন দৈনন্দিন জীবনে কি কি করলে মাস শেষে, বছর শেষে কি কি লাভ করতে যাচ্ছেন আপনি। আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি, সাফল্য লাভ করা না করা একান্তভাবে নির্ভর করছে আপনারই উপর– ফর্মুলাটা কাজে প্রয়োগ করলে সাফল্য অবধারিত, প্রয়োগ না করলে পিছিয়ে পড়া অনিবার্য পরিণতি।

যাদুবিদ্যাটি শেখা হয়ে গেছে আপনার। এই ফর্মুলা বা যাদুবিদ্যাই আপনাকে ঠেলে নিয়ে যাবে সাফল্যের অনন্ত দিগন্তের দিকে।

কাম্যবস্তু অসংখ্য, সবই এক এক করে অর্জন করবেন আপনি। সেগুলো ব্যবহার করবেন, উপভোগ করবেন, সুখী হবেন। কিন্তু কাম্যবস্তু অর্জন করে সুখে জীবন যাপন করতে হলে উন্নতমানের জীবন সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা চাই আপনার।

আপনার কাম্যবস্তুর সংখ্যা যতো বেশিই হোক সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) টাকা। খ) সামাজিক পদ-মর্যাদা। গ) ক্ষমতা।

এই তিনটে যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করে নিয়েই উন্নততর জীবনের অধিকারী হবার জন্যে নতুনভাবে যাত্রায় বের হবেন।

উন্নত জীবনের সন্ধানে বেরুবার আগে কি দরকার আপনার, বলতে পারেন? হ্যাঁ, দরকার প্রস্তুতির। কিন্তু তারও আগে দরকার পরিকল্পনার একটা ছক। ছকের একটা নমুনা এখানে খাড়া করা যাক।

(১) একটা আরো ভালো বাড়ি।

বাড়ি শুধুমাত্র চলনসই একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই নয়। বাড়ি আপনার এমন হওয়া উচিত যে বাড়িতে যতোক্ষণ থাকবেন প্রতিটি মুহূর্ত যেন আরামদায়ক, আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে। বাইরে যখন থাকবেন, বাড়িতে ফেরার জন্যে যেন আপনার মধ্যে একটা ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়। বাড়িটাকে হতে হবে এমনই আকর্ষণীয় সেটি যেন আপনাকে চুম্বকের মতো টানতে পারে।

আপনার এবং আপনার পরিবারের সকল সদস্যের জন্যে বাড়িটাতে যথেষ্ট সংখ্যক কামরা থাকতে হবে, থাকতে হবে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং অতিথিদের জন্যে অতিরিক্ত রুম। প্রতিটি রুমের সাথে সংলগ্ন বাথরুম থাকা অবশ্যই দরকার।

আপনার এবং আপনার স্ত্রীর জন্যে দুটো বিশেষ ঘর প্রয়োজন। আপনি হয়তো আপনার অবসর সময়টা নিজস্ব একটা হবির পিছনে খরচ করতে চান। নির্জনতা দরকার আপনার। লাইব্রেরী বা ড্রয়িংরুমে কখন কে থাকে না থাকে, ঢোকে না ঢোকে, তারচেয়ে আলাদা একটা রুম থাকাই সবদিক থেকে ভালো।

আপনার স্ত্রী হয়তো সেলাই-এর ভক্ত। কিংবা, আড়ালে ছবি আঁকতে ভালবাসেন তিনি। তাঁর জন্যেও দরকার একটা আলাদা, ব্যক্তিগত কামরা।

আপনার বাড়ির সামনে ও পিছনে বাগান থাকবে। সামনে তো থাকবেই। পিছনে যদি প্রচুর জায়গা থাকে, জায়গাটা ফেলে রাখবেন না–চমৎকার একটা সুইমিংপুল হতে পারে ওই জায়গাটায়। সুইমিংপুল ছাড়া বাড়ি ঠিক যেন গ্যারেজ ছাড়া গাড়ির মতো–

অপরিকল্পিত। আজকাল এটার বেশ চল হয়েছে–বিদেশে তো বটেই, দেশেও।

(২) ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা।

বর্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না, ভবিষ্যতের জন্যেও অনেক কিছু করণীয় আছে আপনার। বর্তমানের প্রচুর আয় থেকে ভবিষ্যতের জন্যে নিয়মিত কিছু সঞ্চয় করুন। এমন সব জিনিস কিনে রাখুন, দরকারের সময় যা সহজেই বিক্রি করে নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন। নিজেকে নয় শুধু, সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহী করে তুলুন পরিবারের সকলকে। অল্প অল্প করে সবাই মিলিতভাবে সঞ্চয় করলে মোটা টাকা জমাতে খুব বেশি দেরি হয় না। প্রতিরক্ষা বণ্ড, প্রাইজ বণ্ড, পোস্টাল সেভিংস সার্টিফিকেট ইত্যাদি ধরনের যতোরকম সঞ্চয়ের মাধ্যম আছে, সবগুলো ব্যবহার করুন।

জমি কিনে বাড়ি তৈরি করে ভাড়া দেয়াটা একটা ভালো ইনভেস্টমেন্ট তো বটেই, ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ হিসেবেও গণ্য করা চলে এই ধরনের ইনভেস্টমেন্টকে।

(৩) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

নতুনমানের জীবন যাপন কালে আপনি আপনার ছেলেমেয়েদেরকে শুধু যে লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন তাই নয়, আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আপনার ছেলেমেয়েরা দেশের বা বিদেশের সবচেয়ে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়।

পরিকল্পনার ছকে এরপর একে একে আপনি যোগ করতে পারেন অনেক কিছু: আরো ভালো গাড়ি, বাড়ির ইনটেরিয়র ডেকোরেশন, আরো ব্যাপক আকারে নতুন ব্যবসা, ইত্যাদি।

কাজ-বিশ্রাম-খেলা

আপনার জন্যে আমি একটা প্রোগ্রাম রচনা করেছি।

আপনি কাজ করবেন। আপনি বিশ্রাম নেবেন। আপনি

খেলাধুলা করবেন।

আপনি কাজ করবেন কেন? আপনি কাজ করবেন সুখী হবার জন্যে।

আপনি বিশ্রাম নেবেন কেন? আপনি বিশ্রাম নেবেন অবসন্নতার হাত থেকে দূরে থাকার জন্যে।

আপনি খেলাধুলা করবেন কেন? আপনার জীবনে খেলাধুলার কি ভূমিকা? কাজ করে যে তার একান্ত ভাবেই দরকার হয় চিত্তবিনোদনের। আপনি চিত্তবিনোদনের জন্যে খেলবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, খুব অল্পসংখ্যক লোক তাদের বিশ্রামের সময়টা উপভোগ করে। বিশ্রামের সময়টা পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে–এই নিয়ম সবাই মানে না।

বিশ্রামের সময় কাজের কথা আপনি ভাববেন না। ভাববেন না ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। কোনো সমস্যা সে-সময় কোনোমতেই যেন আপনার মাথার ভিতর ঢুকে না পড়ে। আপনার জানা দরকার, মনকে বিশ্রাম না দিলে দেহ বিশ্রাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

কাজ করার সময় আপনার মধ্যে থেকে শক্তি ক্ষয় হয়, মানসিক এবং দৈহিক দু'ধরনেরই। এই শক্তি ফিরে পাবার একমাত্র উপায় পরিপূর্ণ, নির্ভেজাল বিশ্রাম গ্রহণ।

সুবিন্যস্ত জীবনের জন্যে খেলাধুলা একান্ত জরুরী। আপনি যখন ঘুমান তখন আপনার অবচেতন মন স্বাভাবিকভাবে কাজে বসে। কিন্তু আপনার অবচেতন মন যখন খুশি থাকে, যখন আনন্দে হাবুডুবু খায় তখন আপনার অবচেতন মন দ্বিগুণ গতিতে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আপনার অবচেতন মনকে বেশি খাটাবার জন্যে আপনি খেলাধুলা করবেন।

খেলাধুলার উপকারিতা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। অবশ্য যে খেলাই আপনি খেলুন সেটিকে হতে হবে সঠিক ধরনের। জুয়া খেলাটাও খেলা, কিন্তু সঠিক খেলা নয় এটি আপনার জন্যে। ঘণ্টার

পর ঘণ্টা ধরে বসে আছেন বন্ধ একটি রুমে, রুমের ভিতরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, ঘামের গন্ধ পাচ্ছেন নাকে– মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয় পরিবেশটা। এই খেলার আরো একটা বড় দোষ, দৈহিক ব্যায়াম হচ্ছে না আপনার। সবচেয়ে বড় আপত্তির কারণ, এই খেলার অন্যতম উপাদান নগদ টাকা; পকেট ভর্তি করে টাকা নিয়ে বসতে হবে আপনাকে, উঠে আসতে হবে শূন্য পকেট নিয়ে।

শরীর এবং মন দুটোই উপকৃত হয় এমন খেলা অনেক আছে। সাঁতার, নৌকো চালানো, মাছধরা, টেনিস, ব্যাডমিন্টন–আরো কতো রকম। এগুলোর যে-কোনো একটি খেলে যদি আনন্দ পান, উপকৃত হবেন।

কাজের সময় পাঁচ ঘণ্টা

প্রখ্যাত এক মনোবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন নির্দিষ্ট ক'টা কাজ একনাগাড়ে পাঁচ ঘণ্টা করার পর যে কেউ কাজটির প্রতি চরম বিরক্ত এবং ক্লান্ত হতে বাধ্য। সৌভাগ্যই বলতে হবে, কদাচ কেউ কোনো নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে একনাগাড়ে মগ্ন থাকে। আপনার কাজের মাঝখানে রয়েছে লাঞ্চ-আওয়ার, টি-আওয়ার। বিরতির পর আবার আমরা সেই একই কাজে ফিরে আসি।

একটা কাজ দীর্ঘক্ষণ না করাই ভালো। কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য, নতুনত্ব থাকলে কাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে, অল্প সময়ে বেশি কাজ করা যায়।

নেতৃত্ববোধ

নিজস্ব একটা ভাবমূর্তি গড়ে তোলা দরকার আপনার।

আপনি কারো চাকর নন, আপনারও কেউ চাকর নয়, আপনি আপনার নিজের মতো, আর কারো মতো নন আপনি।

নিজেকে আপনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে করুন। নিজেকে আর

সকলের চেয়ে ভদ্র, আর সকলের চেয়ে সৎ, সত্যবাদী, উদার, নীতিবান, বিবেকবান বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠুন। কারো নিচে নন আপনি–এই রকম চিন্তা-ভাবনা করতে হবে আপনাকে। এমন একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব থাকবে আপনার মধ্যে, যে আপনি কোনো কামরায় প্রবেশ করা মাত্র সবাই কথাবার্তা বন্ধ করে আপনার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চোখ তুলে তাকাবে, আপনাকে সানন্দে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে।

মানুষকে সৎ এবং সঠিক পথ দেখান, পরামর্শ দিন–প্রচুর শ্রদ্ধা এবং সুনাম অর্জন করতে পারবেন। প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করুন, তার বক্তব্যে মনোযোগ দিন, তার দুঃখে কাতর হোন, তার আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করুন, আপনি তার জন্যে চিন্তা করুন, তার কষ্ট অনুভব করেন বুঝতে দিন তাকে, সে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে, আপনার ভক্ত হয়ে উঠবে সে।

নেতা হিসেবে কল্পনা করুন নিজেকে। কিন্তু নেতা হিসেবে নিজেকে কল্পনা করার আগে আপনাকে জানতে হবে নেতা মানে কি।

নেতা মানে শাসক বা শোষক নয়। নেতা মানে পথ-প্রদর্শক, সৎপরামর্শদাতা, সাহায্যকারী। নেতা হতে হলে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে। নেতাকে হতে হয় সদয়, মিষ্টভাষী, অভিজ্ঞ, বিবেচক। সত্যিকার নেতা নিজেকে নেতা বলে ঘোষণা করে না। তার কাজই তাকে নেতৃত্ব এনে দেয়।

আপনি নিজেকে নেতা বলে কল্পনা করুন, সুকর্মের মাধ্যমে নেতৃত্ব গ্রহণ করুন মানুষের কাছ থেকে।

আপনি পারেন না, আপনার দ্বারা সম্ভব নয় এমন কোনো কাজ নেই পৃথিবীতে–এই কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি। এই সত্যে বিশ্বাস রাখুন। স্বপ্ন যখন দেখবেন, বড় বড় স্বপ্ন দেখুন।

আপনি আগেই জেনেছেন, কোনো কাজ করতে পারবেন বলে মনে করলেই সেই কাজ করা যায়। সেই কাজ যাতে করা যায় তার জন্যে আপনাকে সাহায্য করছে আপনার অবচেতন মন। বড় বড় স্বপ্ন দেখুন, বড় বড় কাজে হাত দিন (বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর থিওরি প্রয়োগ করে), ভাবুন বড় স্বপ্ন এবং কাজগুলো বাস্তবায়িত করা আপনার দ্বারা নির্ঘাৎ সম্ভব।

নিজেকে বড় বড় কাজের উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সবচেয়ে আগে ত্যাগ করতে হবে বদভ্যাস। অভ্যাসের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আপনাকে।

অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে অভ্যাসের প্রভু হতে হবে আপনাকে। এই প্রসঙ্গে আপনাকে জানানো দরকার একটি প্রকৃত তথ্য: মানুষ মন-যুক্ত একটি দেহ নয়, মানুষ আসলে দেহ-যুক্ত একটি মন। মানুষের প্রধান অংশ মন। মনই মানুষ। মনের বাসগৃহ দেহ। মানুষের সাথে মানুষের একমাত্র মৌলিক পার্থক্য কোথায়? তাদের প্রত্যেকের মন আলাদা আলাদা। সব মানুষের দেহই এক ধরনের উপাদানের সমষ্টি। সকলের দেহই অক্সিজেন চায়, আহার চায়, বিশ্রাম চায়। কিন্তু কার মন কি চায় তার ফিরিস্তি দেয়া মুশকিল। সকলের মন সমান নয়।

মনই মানুষ, মনই সব–সুতরাং, মনকে বদলান। মন পাল্টালে আপনার দুনিয়া পাল্টে যাবে। অভ্যাসের ফাঁদ থেকে বেরুতে চান? মনকে বোঝান, তাকে রাজি করান।

আপনি শিখলেন, মনই আপনি, আপনিই মন–আপনার দেহ আপনার আধার মাত্র। মনকে বদলান, আপনি বদলে যাবেন।

অধিকাংশ মানুষ মিথ্যেবাদী

রূঢ় এবং ঢালাও মন্তব্য বলে মনে হচ্ছে কথাটাকে?

অধিকাংশ মানুষ পরস্পরের সাথে মিথ্যে কথা বলে কিনা সে বিতর্কিত বিষয়ে আমি যোগ দিতে চাইছি না, আমি বলতে চাইছি বেশিরভাগ মানুষ নিজের কাছে মিথ্যে কথা বলে। কথাটা যে সত্যি আপনিও তা স্বীকার করবেন।

সাধারণত এইরকম ঘটে: আপনি হয়তো কারো কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, অমুক নিয়মটা আর কখনো লঙ্ঘন করবো না। প্রতিজ্ঞা করার পর খুব সাবধানে থাকবেন আপনি, চেষ্টা করবেন প্রতিজ্ঞাটা রক্ষা করতে। কারণ, ভয় আছে, নিয়ম লঙ্ঘন করে ধরা পড়লে লজ্জায় পড়তে হবে, মুখ দেখাতে পারবেন না সে-লোকের কাছে। কিন্তু আপনি যদি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন সে-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার ব্যাপারে তেমন সাবধান হন না, গা করেন না। কারণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেও কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না, কারো কাছে লজ্জায় পড়তে হবে না।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নিজের কাছে অসংখ্য প্রতিজ্ঞা করি–রক্ষা করি ক'টা? আসলে প্রায় সবগুলোই ভঙ্গ করি নির্বিচারে, নির্বিকারে, নির্লজ্জের মতো-এর জন্যে নিজেদের মধ্যে কোনো অপরাধ বোধও নেই। অথচ প্রতিজ্ঞা করে তা রক্ষা না করা অপরাধ বৈকি!

মাস শেষে বেতন পেয়ে সব খরচ করে ফেললেন, কিন্তু সঞ্চয় করবার কথা ভেবে রেখেছিলেন কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না। নিজের

কাছে এবার প্রতিজ্ঞা করলেন, আগামী মাসের বেতন থেকে কিছু টাকা আমি আলাদা করে রাখবোই।

পরবর্তী মাসের বেতন পেলেন। খরচ করলেন সব টাকা। সঞ্চয় করতে পারলেন না। প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন নাকি?

খবরের কাগজে ক্যান্সারের ভয়ঙ্করত্ব সম্পর্কে একটা খবর পড়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেবোই। আধঘণ্টা পর আপনাকে দেখা গেল নতুন একটা সিগারেট আয়েশ করে ধরাচ্ছেন।

আজ আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো, দশটার পরে কোনোমতেই জেগে থাকবো না-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে টিভির সামনে বসলেন। দশটা বাজার খানিক আগে টিভির ঘোষক জানালেন, আজ রাত সাড়ে-দশটায় শুরু হচ্ছে অমুক প্রোগ্রাম···ব্যস, আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন আপনি, এই প্রোগ্রাম না দেখলেই নয়।

এই রকম, প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছেন, পিঁপড়ে মারার মতো সবগুলোকে খুনও করছেন নির্বিচারে।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার প্রতিক্রিয়া খারাপ হতে বাধ্য। আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আপনার অবচেতন মনকে কুশিক্ষা দিচ্ছেন। জীবনে কখনো যদি সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন এবং তা অটুট রাখতে চেষ্টা করেন, কুশিক্ষাপ্রাপ্ত আপনার অবচেতন মন আপনাকে তা অটুট রাখতে দেবে না, প্রতিজ্ঞাটা ভঙ্গ করতে সে আপনাকে প্ররোচিত করবে, আপনার জন্যে ফাঁদ পাতবে।

নিজের কাছে সাচ্চা হওয়া বেশ কঠিন। একদিনে পারবেন না সাধু হতে। নিজের কাছে নিরপরাধ হবার জন্যে, সৎ হবার জন্যে ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে হবে।

আপনি যদি নিজেকে অভ্যাসের প্রভু হিসেবে গড়ে নিতে পারেন, যদি পারেন মনটাকে বদলাতে, নিজের কাছে সৎ এবং নিরপরাধ হওয়াটা মোটেই কঠিন হবে না।

সম্পদের সদ্ব্যবহার

ধন সম্পদের চাবি এখন আপনার হাতে। যতো আপনার দরকার, চাবি দিয়ে তালা খুলে নিতে পারলেই হয়। সঠিক ফর্মুলা প্রয়োগ করে যে অগাধ ধন-সম্পদ অর্জন করবেন আপনি, কি হবে তা দিয়ে আপনার, যদি আপনি অর্জিত ধন-সম্পদের চাকরে পরিণত হন?

সাবধান! আপনার ধন-সম্পদ আপনাকে যেন ক্রীতদাসে পরিণত না করে। ধন-সম্পদের মনিব হওয়া চাই আপনার।

ত্রিশ বছর বয়সে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, ধনী লোকদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এই কথাটি বলেছিলেন, 'ধন-সম্পদ তার নয় যার আছে–ধন-সম্পদ তার যে তা উপভোগ করে।'

ধন-সম্পদ আপনার প্রভুও হতে পারে, আপনার দাসও হতে পারে। ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আপনাকে শিখতে হবে। এটা একটা রীতিমত শিক্ষণীয় বিষয়। এই শিক্ষা আপনাকে পেতে হবে যখন ধন-সম্পদ আহরণ করতে শুরু করবেন তখনই, ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলবার পর নয়।

জমুক, আরো জমুক, তারপর উপভোগ করবো–এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়।

বেন-সুইটল্যাণ্ডের পরিচিত এক যুবক দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে, ধনী সে হবেই।

বিস্ময়কর ত্যাগ এবং বহু বছর কঠোর পরিশ্রম করে সত্যি সত্যি ধনী হয় সে। কিন্তু ধন যখন এলো তখন তার বয়স ষাটের উপর। এই লোক অগাধ টাকার মালিক হলে কি হবে, টাকাকে কিভাবে সদ্ব্যবহার করতে হয় তা সে জানতো না। অঢেল টাকা থেকে কিয়দংশও নিজের বা পরিবারের কারো আনন্দ-উপভোগের জন্যে খরচ করেনি সে তখনও। ছোট্ট, নোংরা একটা বাড়িতে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে বাস করছিল সে কয়েক যুগ ধরে। বাড়ির যাবতীয় কাজ তার স্ত্রীকেই করতে হতো। লোকটা এক ডলার খরচ করতে পঁচিশবার নিজেকে জিজ্ঞেস করতো, খরচটা না করলেই কি নয়?

মন্দা এলো ১৯২৯ সালে। সেই মন্দায় লোকটার অঢেল টাকা কর্পূরের মতো উবে গেল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে যা সে রোজগার করেছিল, তা দিয়ে এক মুহূর্তের আনন্দও কিনতে পারেনি এই লোক।

ধন-সম্পদ যখন হয়েছে আপনার, তার সদ্ব্যবহার করুন। নিজেকে আনন্দ দিন, উপভোগ করুন। সেই সাথে অপরকেও সুখ দিন, আনন্দ দিন।

সুখের বিনিময়ে সুখ

অন্যকে সুখী করা থেকে যে সুখ আসে সেই সুখই সত্যিকার সুখ।

আপনার দখলে যা যা আছে তা যদি শুধু আপনি একাই ভোগ-দখল করেন, আনন্দ পাবেন না। দিয়ে থুয়ে ভোগ করুন, ভোগের আনন্দ শতগুণ বেড়ে যাবে।

কেউ আপনার অধীনে চাকরি করে। তার মাসিক প্রাপ্য অর্থাৎ বেতন সে নিয়মিত নিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে হারে বেতন দেয় আপনিও আপনার কর্মচারীকে সেই হারে বেতন দিচ্ছেন। অর্থাৎ তাকে আপনি ঠকাচ্ছেন না। কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠান আপনার মতো বেশি টাকা রোজগার করছে না। এরকম ক্ষেত্রে আপনার কর্মচারীকে আপনি নির্ধারিত বেতন ছাড়াও টাকা দিতে পারেন, দেয়া উচিত আপনার। কর্মচারীরা কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটায় অথচ আপনার প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রেখেছে তারাই। বিবেকের বিচারে কর্মচারীরা আপনার কাছ থেকে বেতন ছাড়াও পুরস্কার হিসেবে বা উপহার হিসেবে কিংবা সাহায্য বা দান হিসেবে কিছু পেতে পারে। এটা তার দাবি নয়, আপনার বিবেচনা।

আপনি যদি সম্পদশালী হন, কাউকে দাবিয়ে রাখা অপরাধ। প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার আছে তার ভাগ্যকে পরিবর্তন করার, কখনো তাতে আপনি বাদ সাধতে পারেন না। বরং আপনার উচিত তাকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করা।

দুনিয়াতে কিছু লোক আছে যারা নিতান্তই সৎ, নিরীহ এবং আন্তরিক। এদের কর্ম কিনতে পারেন আপনি অনায়াসে। এদের কর্ম কিনে তা বিক্রি করেই ধন-সম্পদের অধিকারী হয় অধিকাংশ ধনীরা। এদের প্রতি বিশেষ ভালবাসা, স্নেহ, সহানুভূতি থাকা দরকার আপনার মধ্যে। সে আপনাকে প্রচুর দিচ্ছে না? তা যদি হয়, তাকেও আপনি প্রচুর দিন এবং সে যাতে প্রচুর পায় তার নানা প্রকার ব্যবস্থা করুন।

পাওয়ার উপায়

পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে দেয়া। কেউ যদি প্রচুর পরিমাণে না পায়, মনে করতে হবে প্রচুর পরিমাণে দিচ্ছে না সে, তাই পাচ্ছে না।

দেয়া-নেয়ার এই নিয়ম প্রকৃতির কাছ থেকে শিখতে পারেন আপনি। গাছ তার শুকনো পাতা ছেড়ে দেয়, সে জানে নতুন পাতা পাবে সে। এমন কোনো গাছ আপনি দেখেছেন যে নতুন পাতা পাবে না এই ভয়ে শুকনো পাতা ধরে রেখেছে? প্রকৃতির প্রতিটি অংশ শুধুই দিয়ে চলেছে। অথচ মানবজাতি-প্রকৃতিরই অংশ বা সন্তান–এই মৌলিক আইন লঙ্ঘন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।

শুধু ধন-সম্পদ থাকলেই আপনাকে ধনী বা সম্পদশালী বলা যায় না। তাছাড়া, সম্পদ হয়ও অনেক রকম। আপনি সৎ, এটা আপনার একটা সম্পদ। কিন্তু এই সম্পদের ব্যবহার যদি না করেন, কি তার মূল্য? এক কানাকড়িও নয়। আর ব্যবহার করলে? লোকে আপনাকে বিশ্বাস করবে, আপনার প্রশংসা করবে, আপনাকে শ্রদ্ধা করবে।

বয়স সবচেয়ে বড় সম্পদ

বয়স যে একটা সম্পদ একথা ব্যাখ্যা করে বলবার দরকার করে না। আমরা সবাই কথাটা জানি। কিন্তু আমাদের জানার মধ্যে কিছু কিছু ভুল আছে, থাকা স্বাভাবিক।

অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস, যুবক বয়সটা নিঃসন্দেহে একটা

সম্পদ, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সটা কক্ষনো সম্পদ হতে পারে না। এটা ভুল।

বৃদ্ধ পাঠক, আপনি হয়তো ভাবছেন, 'বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি আমি, বিদ্যুৎ মিত্রের ফর্মুলা আমার জন্যে নয়, নতুন জীবন শুরু করার সে বয়স আর নেই আমার।' যথোচিত সম্মান এবং শ্রদ্ধা সহকারে বলছি আপনাকে, আপনি ভুল করছেন।

নতুন জীবন শুরু করতে হলে বুড়ো হওয়া চলবে না একথা খাঁটি। বুড়ো লোককে দিয়ে কোনো কাজ হয় না, ঠিক। কিন্তু বুড়ো কে? কোন্ বয়সটাকে বুড়ো বয়স বলে?

বুড়ো হবার কোনো বয়স নেই। আসলে মানুষ বুড়ো হয় তখনই যখন সে নিজেকে বুড়ো বলে মনে করে। কারো বয়স চল্লিশ, সে নিজেকে বুড়ো বলে মনে করলে কারো কিছু করার নেই—নতুন জীবন শুরু করা হলো না তার।

নির্দিষ্ট কোনো বয়সকে বুড়ো বয়স বলে না। বেন-সুইটল্যাণ্ড ষাটের পর সাফল্য অর্জন করেছেন। নিজেকে তিনি বুড়ো বলে মনে করলে সাফল্য অর্জন করা কি তাঁর দ্বারা সম্ভব হতো?

বয়স মাত্রই সম্পদ, আপনার বয়স পঞ্চাশই হোক আর আশি-নব্বই-ই হোক।

মনীষীদের জীবনী ঘেঁটে দেখুন, তাঁরা তাঁদের তথাকথিত মধ্যবয়স অতিক্রম করার পরই মহৎ কিছু সৃষ্টি করেছেন।

নিজেকে বুড়ো মনে করলেই আপনি বুড়ো। নিজেকে বুড়ো মনে করলে মৃত্যুভয় জাগে। মৃত্যুভয় মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনে।

পঞ্চাশ বছর বয়সের দিকে অনেক মানুষ মনে করে তারা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। তাদের আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায় বুড়োমি প্রকাশ পায়। এরা আসলে নিজেদেরকে আরো বুড়ো হতে সাহায্য করছে। এই সাহায্য করাটা যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারার মতো, জানে না তারা।

মানুষ শারীরিক দিক থেকে সাবালক হয় বিভিন্ন বয়সে, তবে সাধারণত ১৬ থেকে ২০ বছরের এদিক ওদিক হয় না। কিন্তু মানসিক

ম্যাচিউরিটি, দুর্বল দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, ৫০-এর আগে আসে না। কিন্তু আমরা যখন পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছাই, মৃত্যুকে গ্রহণ করার জন্যে মনে মনে তৈরি হতে শুরু করে দিই।

মৃত্যু অবধারিত, অনন্তকাল বেঁচে থাকার মহৌষধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি যখন। কিন্তু মরার আগে মরবেন কেন আপনি? নিজেকে বুড়ো মনে করা মৃত্যুর সমান–ভুল হলো–মৃত্যুর বাড়া!

যে মৃত তার নিজের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যে বুড়ো তার রাজ্যের সমস্যা আছে অথচ সমাধান বের করার উপায় জানা নেই।

নিজেকে, বয়স আপনার যতোই হোক, কক্ষনো বুড়ো বলে মনে করবেন না।

সেই লোকই বুড়ো যে নিজেকে বুড়ো মনে করে।

নিজেকে জানুন

একটা গল্প শুনুন।

দুটো প্রধান চরিত্র: একজন, তার অগাধ ধন-দৌলত আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য তার খুবই খারাপ; অপরজন, তার টাকা-পয়সা নেই কিন্তু স্বাস্থ্যটা দেখবার মতো, যেন ব্যায়ামবীর। এরা একজন অপরজনকে ঈর্ষা করে।

ধনী লোকটা তার সর্বস্ব ধন-সম্পদ দিয়ে দিতে রাজি আছে যদি সে তার বিনিময়ে ভালো স্বাস্থ্য পায়, ওদিকে গরীব লোকটা এক কথায় রাজি হয়ে যাবে প্রচুর নগদ টাকা-পয়সা পেলে তার স্বাস্থ্যটা হারাতে।

পৃথিবী বিখ্যাত এক সার্জেন এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার

করলেন যার সাহায্যে এক দেহ থেকে আরেক দেহে ব্রেন বদলাবদলি করা সম্ভব।

ধনী লোকটা গরীব লোকটার সাথে একটা চুক্তি করলো। চুক্তি অনুযায়ী তারা পরস্পরের ব্রেন বদল করবে। ফল দাঁড়াবে, ধনী লোকটা হবে পথের ফকির কিন্তু অত্যন্ত ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী, গরীব লোকটি হবে প্রচুর ধন-দৌলতের মালিক কিন্তু তার শরীর হবে দুর্বল, রোগ-জর্জরিত।

অপারেশন সফল হলো। গরীব লোকটা হলো ধনী, ধনী লোকটা পরিণত হলো ভিখিরিতে। কিন্তু...দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি ঘটলো।

প্রাক্তন ধনী লোকটার মধ্যে সবসময় সাফল্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় সচেতনতা বিদ্যমান ছিলো। গরীব হওয়ার পরও সেই সচেতনতা তার মধ্যে অটুট রইলো। জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে কি করতে হয় তা সে জানে। সেই জানা কৌশলটা সে ব্যবহার করতে শুরু করলো এবং অচিরেই আবার অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হয়ে উঠলো। কিন্তু স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অতি-সচেতনতার ফলে, একটু সর্দি লাগলে বা বুক-মাথা একটু ব্যথা করলে ভীষণ রকম ঘাবড়ে যেতো সে, মুষড়ে পড়তো। হজম হবে না এই ভয়ে ভালো খাওয়া-দাওয়া করতো না সে। ফলে, উত্তম, নীরোগ স্বাস্থ্যটা ভেঙে পরিণত হলো দুর্বল রোগজর্জরিত স্বাস্থ্যে। অন্য কথায়, সে তার সাবেক অবস্থায় ফিরে এলো–ধনী একজন মানুষ কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী।

এবার দেখা যাক, নব্য কোটিপতি লোকটার বেলায় কি ঘটনা ঘটছে।

সাফল্য সম্পর্কে এই লোকটার কোনো ধারণাই নেই। গরীব ছাড়া নিজেকে লোকটা আর কোনো কিছু ভাবতেই পারতো না। অকস্মাৎ হাতে অগাধ ধন-সম্পদ এসে পড়ায় দিশেহারা হয়ে পড়লো সে। সুবিন্যস্ত জীবনধারা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকায়, উন্নত মানের জীবন যাপন কাকে বলে তা জানা না থাকায় টাকা পয়সা না ব্যয়

করলো নিজের উপভোগের জন্যে, না কোনো গঠনমূলক প্রকল্পে। তার টাকা পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খেলো, বাকি যা ছিলো ব্যবসা করতে গিয়ে অনভিজ্ঞতা ও অবহেলার দরুন সব হারালো। আবার সে পরিণত হলো একটা গরীব মানুষে। কিন্তু, তার স্বাস্থ্য? সে অন্য গল্প।

স্বাস্থের ব্যাপারে কক্ষনো সে দুশ্চিন্তায় ভুগতো না। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভুলেও সে খারাপ কিছু ভাবতো না। স্বাস্থ্য ভালো আছে, বেশ আছে, এই ছিলো তার একমাত্র বিশ্বাস। বাছ বিচার করে খাওয়া কাকে বলে, জানতো না। খাবার যা পেতো, পেট ভরে খিদে মিটিয়ে খেতো। হজম হবে কি হবে না এ বিষয়ে মাথা ঘামাতো না। ফলে স্বাস্থ্যটা তার পূর্বের মতো হয়ে উঠলো। অর্থাৎ আবার সে স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠলো।

গল্পটা থেকে শিক্ষণীয় কি পাচ্ছি আমরা?

'আমরা নিজেকে যা মনে করি আমরা তাই!'

নিজেকে জানুন, আপনি নিজেকে শিল্পী বলে জানুন, শিল্পী হতে পারবেন অনায়াসে। নিজেকে আপনি বুদ্ধিমান বলে জানুন, দেখবেন, সত্যি সত্যি বুদ্ধিমান হয়ে উঠবেন আপনি।

নিজেকে জানাটাই বড় কথা। শিল্পী, লেখক, গায়ক, ব্যবসায়ী, নেতা, খেলোয়াড়–কি হতে চান জেনে নিন। হওয়াটা তখন অনায়াসসাধ্য হবে।

এবার আসুন, পিছনের ফেলে আসা পরিচ্ছেদগুলোর কিছু কিছু স্মৃতি রোমন্থন করা যাক। রোমন্থন উপকারী অভ্যাস, যদি তা থেকে কিছু শিখে নিতে পারেন আপনি, সংশোধন করে নিতে পারেন ত্রুটিগুলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ: এই পরিচ্ছেদে আপনি শিখেছেন, সাফল্য গন্তব্য স্থান নয়, ভ্রমণ বা যাত্রা। সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে যেই মুহূর্তে পা রাখলেন পথে সেই মুহূর্তে সাফল্য লাভ করলেন আপনি। ব্যাঙ্কে টাকা জমা হোক, নতুন বাড়ি কেনা হোক, সব দেনা শোধ হোক–সফল হবার আগে এসবের জন্যে আপনার অপেক্ষা করবার দরকার নেই।

এই মুহূর্তে, যখন আপনি সাফল্য লাভ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসেবে মনে করতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ এই পরিচ্ছেদে আপনি শিখেছেন আপনার চাওয়া এবং হওয়ার তালিকা কিভাবে তৈরি করতে হবে। সুখী হওয়ার সহজ উপায় কি জানানো হয়েছে আপনাকে। প্রত্যক্ষদর্শন কতোটা উপকারী ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ এই ফর্মুলার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হলো, মানুষের মন থেকে নেতিবাচক মনোভাব সমূলে উৎপাটন করতে হবে। ইতিবাচক, হ্যাঁ-সূচক, আশাব্যঞ্জক এবং গঠনমূলক চিন্তাভাবনা ও মনোভাবের অধিকারী হতে হবে আপনাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সুখ। সুখ ভাড়ায় পাওয়া যায় না। সুখ রয়েছে আপনার মধ্যেই। সুখী বলে নিজেকে মনে করাই সুখী হবার সর্বোত্তম উপায়। সাফল্য চান? চাইলে, আগে সুখী হোন। যে সুখী নয়, তার দ্বারা সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ গভীর আগ্রহ। গভীর আগ্রহ প্রচণ্ড একটা পরিচালিকা শক্তি। আপনি শিখেছেন গভীর আগ্রহবোধ কিভাবে নিজের মধ্যে আমদানী করা যায়। গভীর আগ্রহবোধ কাজকে ভালবাসতে শেখায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ অতৃপ্তি। মানুষের অতৃপ্তিই স্পৃহা যুগিয়েছে মানব সভ্যতাকে গড়ে তুলতে। যতো বড় বড় আবিষ্কার, মহৎ শিল্পকর্ম, বিস্ময়কর সাফল্য–অতৃপ্তির বদৌলতেই সম্ভব হয়েছে। আপনি শিখেছেন কিভাবে অতৃপ্তি দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ অ্যাকশন। চিন্তা বা আইডিয়ার কোনোই দাম নেই যদি সেটাকে কাজে, বাস্তবে রূপান্তরিত করা না যায়। আপনি শিখেছেন দু'ধরনের এনার্জির কথা। পোটেনশিয়াল এনার্জি এবং কাইনেটিক এনার্জি। আপনি আরো শিখেছেন নিষ্ক্রিয়তা কারণ নয়, ফলাফল। উপদেশ দেয়া হয়েছে, কাজে নামুন, কাজে হাত দিন, কাজের ভেতর দিয়ে এগোন–জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দুটোই অর্জন করা

সম্ভব হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ ধারাবাহিকতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো কিছুই স্থির হয়ে নেই; আপনারও স্থির হয়ে থাকলে চলবে না। এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় কাজ করা। কাজের পর কাজ, একের পর এক কাজ করে যেতে হবে আপনাকে। একটা কাজ প্রথমে শেষ করুন, শেষ হবার পরই আপনি অপর কাজে হাত দেবেন। কাজের পর আবার কাজে হাত দিন। এগিয়ে যান অবিরত।

নবম পরিচ্ছেদঃ উপাদান। আপনার কাম্যবস্তু একক কোনো জিনিস দিয়ে তৈরি নয়, ওটা কয়েক প্রকার উপাদানের সমষ্টি। আপনি শিখেছেন, কাম্যবস্তুকে ভালবাসতে হবে, তাকে কল্পনার চোখে দেখতে পেতে হবে। আপনার কাম্যবস্তু কেউ তৈরি করে রাখেনি, আপনিই তাকে বিভিন্ন উপাদান সহযোগে তৈরি করবেন।

দশম পরিচ্ছেদঃ বিভক্তিকরণ এবং সংযুক্তকরণ। যে-কোনো কাম্য-বস্তুকে দু'ভাবে দেখতে শেখানো হয়েছে। প্রথমে কাম্যবস্তুর স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপটা দেখুন বা চিন্তা করুন, তারপর সেটাকে দেখুন কয়েকটা ভাগে ভাগ ভাগ করে, বিভক্ত করে। এই পদ্ধতিতে দেখায় বা চিন্তা করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে আপনাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদঃ বৃহত্তর-ক্ষুদ্রতর। আপনার স্বয়ংসম্পূর্ণ কাম্যবস্তুকে আপনি বৃহত্তর কাম্যবস্তু বলে মনে করুন। বৃহত্তর কাম্যবস্তুটিকে এবার ভাঙুন টুকরো টুকরো করে। এই টুকরোগুলো আপনার ক্ষুদ্রতর কাম্যবস্তু। এই ভাঙা টুকরোগুলোর একটা তালিকা তৈরি করুন। তালিকায় উপর দিকে থাকবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রতর কাম্যবস্তুগুলো। তালিকার এক নম্বর ক্ষুদ্রতর কাম্যবস্তুটি অর্জন করতে হবে আপনার। তারপর দু'নম্বরটা, এরপর তিন নম্বরটা—এইভাবে এক এক করে সবগুলো অর্জন করার চেষ্টা করতে যাচ্ছেন আপনি।

তালিকার এক নম্বর ক্ষুদ্রতর কাম্যবস্তুটি অর্জন করতে যাওয়ার আগে ওটিকে ক্ষুদ্রতর কাম্যবস্তু না ভেবে, ভাবুন ওটিই আপনার বর্তমানের বৃহত্তর কাম্যবস্তু। এই পদ্ধতিতে যখন যে ক্ষুদ্রতর কাম্যবস্তু

অর্জন করার পালা আসবে তখন সেইটিকেই ভাবুন বৃহত্তর কাম্যবস্তু হিসেবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ জীবনের নতুন মান। নিজেকে তৈরি করাটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সাফল্য লাভের চাবিকাঠি রয়েছে আপনার হাতে। ফর্মুলাটা কাজে প্রয়োগ করলে সাফল্য লাভ অবধারিত, প্রয়োগ না করলে পিছিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ আপনি পারেন না এমন কোনো কাজ নেই পৃথিবীতে, এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে আপনাকে।

আমরা নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছি, নিজেদের কাছে মিথ্যে কথা বলছি, কিন্তু তার জন্যে কোনো অপরাধবোধে ভুগছি না। এর প্রতিক্রিয়া খারাপ হতে বাধ্য।

আপনি নিজের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করবেন সেটা ভঙ্গ করে আপনার অবচেতন মনকে কুশিক্ষা দিচ্ছেন। আপনার অবচেতন মন আপনার উপরই প্রতিশোধ নেবে।

সম্পদের সদ্ব্যবহার করার নিয়ম জানানো হয়েছে আপনাকে। আপনার ধন-সম্পদ যেন আপনার প্রভু না হয়ে ওঠে। আপনার জন্যে যে আন্তরিকভাবে কাজ করছে, তাকে সুখী মানুষ হতে সুযোগ করে দিন।

কেউ যদি প্রচুর পরিমাণে না পায় মনে করতে হবে প্রচুর পরিমাণে দিচ্ছে না সে, তাই পাচ্ছে না।

বয়স মাত্রই সম্পদ, আপনার বয়স পঞ্চাশ-ই হোক আর নব্বই-ই হোক। বুড়ো সে-ই যে নিজেকে বুড়ো বলে ভাবতে শুরু করেছে, আর কেউ নয়।

কার্যসাধন প্রণালী

মনকে নিয়েই আমাদের কারবার। মনই মানুষ। মন যদি বলে পারবো, তবে পারা যাবে। মন যদি বলে পারবো না, পারা যাবে না।

মনের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন আপনি। অতএব মনকে বশ করুন, অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবেন। মনকে রাজি করান সুখী হতে। মনকে রাজি করান সাফল্য অর্জন করতে। মনই আপনার পুঁজি, আপনার মূলধন, আপনার ভাগ্য-নিয়ন্তা।

এই যে মন, একে আমরা কতোটুকু চিনি?

মনকে চেনাটা জরুরী। মনকে চিনতে পারলে মনের কাছ থেকে লক্ষ-কোটি মণি-মুক্তো আদায় করে নেয়া সম্ভব হবে আপনার পক্ষে।

মনকে বশ করার উপর আপনার জয়-পরাজয় নির্ভর করছে। মনকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে হলে কি করতে হবে ইতিমধ্যে জেনেছেন আপনি।

মনের ভিতর আরো ভালোভাবে দেখতে হলে সম্মোহন বিদ্যায়, অটোসাজেশন এবং আত্মসম্মোহন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। সম্মোহন, অটোসাজেশন এবং আত্মসম্মোহন, এগুলোর সাহায্যে মনের ভিতরটা দেখতে পাবার সুযোগ তো পাবেনই আপনি, তার ওপর, এই বিদ্যা কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট সাফল্য অর্জনে কামিয়াব হবার সুযোগও পাবেন।

অবচেতন মন

অবচেতন মনের অনেক নাম। কেউ বলে সাবজেকটিভ, কেউ বলে

সাবলিমিনাল, কেউ বলে অচেতন।

আমরা অবচেতনই বলবো, এটাই বহুল প্রচলিত। অবচেতন মন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা না থাকলে সম্মোহন কি এবং কেন, ঠিক বোঝা যাবে না। তবে, কি জানেন, অবচেতন মন সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান এখনও বেশি কিছু একটা জানতে পারেনি। অবচেতন মন এখনও একটা প্রায় অপরিচিত রহস্য। তবে জানা গেছে, এই মনের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হলো সম্মোহন।

শরীরের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে অবচেতন মন। এই মন শরীরে ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং গ্ল্যাণ্ডের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নার্ভাস সিস্টেমের সাহায্যে।

আমাদের চেতন মনের সাথে অবচেতন মনের পার্থক্য অনেক। যেমন, চেতন মন বহু কথা, বহু ঘটনা ভুলে যায় কিন্তু অবচেতন মন কিছুই ভোলে না।

অবচেতন মন কর্তব্যপরায়ণ এবং দায়িত্বশীল। এর প্রধান কাজের অন্যতমটি হলো আপনাকে রক্ষা করা। আপনি জেগে, ঘুমিয়ে বা অজ্ঞান অবস্থায় থাকুন, আপনার অবচেতন মন সজাগ থাকছে সবসময়, বিপদ-আপদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্যে।

এই মনটির সাহায্য নিতে পারলে আপনি আপনার বদভ্যাসগুলো ত্যাগ করতে পারবেন খুব সহজে। এই মনের সাহায্য পেলে আপনার চেতন মনকে আপনি বশে আনতে পারবেন, গড়ে তুলতে পারবেন সু-অভ্যাস, সাফল্য অর্জনে প্রত্যক্ষ সাহায্য আদায় করে নিতে পারবেন। সাহায্য পাবেন কিভাবে? সম্মোহনের মাধ্যমে।

সম্মোহিত হবার যোগ্যতা

শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষ সামান্য চেষ্টাতেই হালকা, মাঝারি বা গভীর সম্মোহনের স্তরে পৌঁছে যেতে পারে একটু চেষ্টা করলেই। অথচ অধিকাংশ লোকের ধারণা, তার সম্মোহিত হবার মতো যোগ্যতা নেই। যে সব লোক দাবি করে তাদের মনটা পাথরের মতো শক্ত, তাদেরকে

সম্মোহিত করা সম্ভব নয়—এরাই আসলে চট করে সম্মোহিত হয় এবং গভীর স্তরে চলে যায়।

সন্দেহপ্রবণ, মিনমিনে স্বভাবের লোক যারা তাদেরকে সম্মোহিত করা সত্যিই কঠিন।

সুস্থ, সবল মনের অধিকারী সম্মোহিত হয় সহজে। বুদ্ধিমানেরাও সম্মোহিত হয় তাড়াতাড়ি। বোকা এবং পলায়নী মনোবৃত্তির লোকেরা সম্মোহিত হয় না, হলেও বড্ড দেরিতে হয়। তবে ব্যতিক্রম আছে। সম্মোহিত হওয়া না হওয়া আরো বহু কিছুর উপর নির্ভর করে।

কি কি কাজে লাগে

শারীরিক ব্যথা-বেদনা দূর করা যায় সম্মোহনের সাহায্যে। আজকাল সম্মোহনের সাহায্যে অচৈতন্য বা শরীরের অংশবিশেষকে অসাড় করে দিয়ে কঠিন কঠিন সার্জিক্যাল অপারেশন হচ্ছে। বুক চিরে হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার হচ্ছে, একটা ফুসফুস অপারেশন করে বের করে আনা হচ্ছে—এতোটুকু ব্যথা পাচ্ছে না রোগী।

মানুষ তার অতীতে ফিরে যেতে পারে সম্মোহনের সাহায্যে। আপনার জীবনে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে যা কিছু দেখেছেন, শুনেছেন বা অনুভব করেছেন সব জমা আছে আপনার স্মৃতিতে। সচেতনভাবে মনে করবার চেষ্টা করলে সব মনে আসে না। সামান্য কিছু মনে আসে। কিন্তু সম্মোহিত অবস্থায় প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি শুধু স্মরণ করতে পারা নয়, সেই অতীতের ঘটনায় ফিরে যেতে পারেন আপনি।

সম্মোহনকে ব্যবহার করে মনো-বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় বিস্ময়কর সব ফল পাওয়া গেছে। চারিত্রিক দুর্বলতা, বদভ্যাস, এবং হালকা স্নায়বিক বৈকল্য সারিয়ে তোলা সম্ভব আত্মসম্মোহনের সাহায্যে।

শিক্ষার ব্যাপারেও আশ্চর্য অবদান রাখছে সম্মোহন। অনেকে অভিযোগ করেন, 'কাজে মন বসাতে পারি না, গভীর আগ্রহবোধের অভাব রয়েছে আমার মধ্যে,' কিংবা, 'স্মরণশক্তি নেই আমার।'

আত্মসম্মোহন এদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে, এঁরা গভীর আগ্রহবোধের অধিকারী হবেন, স্মরণশক্তি প্রচুর বেড়ে যাবে।

অটোসাজেশন

ইংরেজি সাজেশন শব্দটির উপযুক্ত প্রতিশব্দ না পাওয়ায় আমরা সাজেশন শব্দটিকেই ব্যবহার করছি।

সাজেশনের সাহায্যে অবচেতন মনকে প্রভাবিত করা হয়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা সবাই কম বেশি সাজেশনের দ্বারা প্রভাবিত হই—এ আপনি আগেই জেনেছেন। এই সাজেশন জিনিসটাই ব্যবহার করবেন আপনি নেতিবাচক মনোভাবের বদলে ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হবার জন্যে।

অটো-সাজেশনের চেয়ে হিটারো-সাজেশন অনেক বেশি শক্তিশালী। সম্মোহিত অবস্থায় আপনি নিজেকে যা বলবেন অবচেতন মন সেটাকে যতো তাড়াতাড়ি গ্রহণ করবে তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি গ্রহণ করবে যদি সেই একই কথা আর কেউ বলে।

সাজেশন জিনিসটা অনেক রকম করে বলা যায়। আদেশের সুরে বলতে পারেন, সাদামাঠা বক্তব্য পেশের কায়দাতেও বলতে পারেন। সরাসরি কিংবা ঘুরিয়েও বলা যেতে পারে। তবে না-সূচক বাক্য ব্যবহার করবেন না। 'নিজেকে আমি অযোগ্য মনে করবো না।'—এই না-সূচক বাক্যটিকে হ্যাঁ-সূচক করা যায় এইভাবে, 'নিজেকে আমি যোগ্য মনে করবো।'

আদেশ কেউ পছন্দ করে না, আপনার অবচেতন মনও না। সাদামাঠা ভাবে বক্তব্য রাখলে সাধারণত ফল বেশি পাওয়া যায়।

যে-কোনো সাজেশন মনের মধ্যে গেঁথে দেবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে পুনরাবৃত্তি। প্রত্যেকটি সাজেশন দশবার, বিশবার, কিংবা আরো বেশিবার পুনরাবৃত্তি করা দরকার।

কোনো একটি সাজেশনের পিছনে যদি অন্তরের তাগিদ বা অনুপ্রেরণা থাকে তাহলে অবচেতন মন সেটা চট করে মেনে নেয়।

সাফল্য লাভ করার ইচ্ছাটা আপনার যতো জোরালো হবে ততোই সহজ হবে লাভ করা।

যে-কোনো সাজেশন কার্যকরী করার ব্যাপারে কাল্পনিক ছবির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাজেশনের কথাগুলোর সাথে যদি কল্পনা যুক্ত হয় তাহলে দুয়ে মিলে গভীর ছাপ ফেলতে পারে আপনার অবচেতন মনের উপর। ঘনঘন কোনো ছবি মানসচক্ষে দেখলে অবচেতন মন সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। কেন হয় জানা যায়নি, কিন্তু হয়। মানসপটে চাহিদার ছবিটি যে যতো পরিষ্কার, স্পষ্ট দেখতে পাবে, তার চাহিদাটা ঠিক ততোই তাড়াতাড়ি পূরণ হবে। এই-ই নিয়ম।

একসাথে অনেক বেশি সাজেশন দিয়ে আপনার অবচেতন মনকে দিশেহারা করে তুলবেন না। যে-কোনো একটি ব্যাপারে সাজেশন দেয়া ভালো। বদভ্যাস ছাড়তে চান, নিজের প্রতি আস্থা আনতে চান, সুখী হতে চান, কাজে গভীর আগ্রহ আনতে চান–সব যদি একসাথে এক সিটিংয়ে চান তাহলে সব গুলিয়ে যাবে–কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন না। প্রতিদিন পুনরাবৃত্তির জন্যে প্রতি সপ্তাহে একটি মাত্র সাজেশন নিন, পরের সপ্তাহে আর একটাকে ধরুন।

ডক্টর জেম্‌স এম. হিক্সন বলেছেন, অবচেতন মনকে যে বক্তব্যটা গ্রহণ করাতে চান সেটাকে বিস্তারিতভাবে লিখে ফেলুন আগে। তারপর লিখিত বক্তব্যের সারমর্ম লিখুন। সারমর্মটাকে আরো সংক্ষিপ্ত করে একটা বা দুটো লাইনে দাঁড় করান। বাড়তি কথা সব বাদ দিন, যেটা চান সেটাই শুধু থাকুক।

আপনি যা চাইছেন সেটাকে হ্যাঁ-সূচক একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ধরতে হবে। কিভাবে কাজটা করতে হবে তা জানা আছে আপনার অবচেতন মনের, সুতরাং আপনি যে ফলাফলটা চান বেশি কথা না বাড়িয়ে শুধু সেটারই উল্লেখ করুন সংক্ষেপে। এই একটি বাক্যে আপনি ঠিক কি কি বোঝাতে চাইছেন ভেবে নিন ভালো করে।

ধরা যাক, আপনি একটা বাক্য তৈরি করলেন: আমি বড় হবো। আমি বড় হবো–এই কথাটি দিয়ে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চান–শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক বা সামাজিক কোন্ দিক থেকে কোন্ বিষয়ে কতো বড় হতে চান সে-সব ভালো করে বুঝে নিন একবার। তারপর সব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিয়ে তোতাপাখির মতো শুধু আউড়ে যান: আমি বড় হবো, আমি বড় হবো, আমি বড় হবো…।

আত্মসম্মোহন

প্রথমে আর কারো দ্বারা সম্মোহিত হওয়া আত্মসম্মোহন শেখার সবচেয়ে সহজ নিয়ম। সাধারণত এই নিয়ম এক বৈঠকেই শিখে নেয়া যায়।

সম্মোহনকারী আপনাকে সম্মোহিত করে পোস্ট-হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে দেবেন। বাতলে দেবেন সংক্ষিপ্ত একটি নিয়ম। কি করে সম্মোহিত হতে হবে এবং গভীরতর স্তরে কিভাবে পৌঁছুতে হবে সে ব্যাপারে দু'চার কথা তিনি বলে দেবেন, হয়তো দুটো একটা শব্দ গেঁথে দেবেন আপনার মনে–ব্যস, শেখা হয়ে গেল।

যখনই সম্মোহিত হতে চাইবেন, প্রাথমিক নিয়মগুলো পালন করবার পর (যেমন, ঢিলে জামাকাপড় পরে নরম বিছানায় শোয়া, বা ইজি চেয়ারে আরাম করে বসা ইত্যাদি) আপনি বারকয়েক শুধু সেই বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলেই আত্মসম্মোহিত হয়ে পড়বেন। নিজে নিজে কয়েক দিন প্র্যাকটিস করলেই গভীর স্তরে পৌঁছে যেতে পারবেন।

আর একটি উপায় হচ্ছে কোনো বন্ধু বা টেপ রেকর্ডারের সাহায্য গ্রহণ করা। আমরা এই উপায়টি যোগ করছি এই পরিচ্ছেদে। কোনো কিছুর সাহায্য না নিয়ে একা একাও আত্মসম্মোহন শেখা যায়–সেই পদ্ধতি জানা যাবে 'আত্মসম্মোহন' শীর্ষক গ্রন্থে (শিগগিরই সেটি পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে প্রজাপতি প্রকাশন থেকে)।

আত্মসম্মোহন শিক্ষা

আত্মসম্মোহন শিক্ষার জন্যে যে কথাগুলো দেয়া হচ্ছে সেগুলো রেকর্ড করবার আগে স্পষ্ট উচ্চারণে অন্তত বারতিনেক জোরে জোরে পড়ুন। এর ফলে রেকর্ডিংটা ভালো হবে। কণ্ঠস্বরটা যেন বেশি ওঠানামা না করে সেদিকে লক্ষ রাখবেন–মোটামুটি একঘেয়ে একটানা একটা ভাব বজায় রাখলে সম্মোহনের জন্যে সুবিধা হবে। ধীর একটা ছন্দ পেয়ে যাবেন বার দুয়েক অভ্যাসের পরই। ছন্দটা বজায় রাখার চেষ্টা করুন। নিজে যদি রেকর্ড করতে খুব অসুবিধে বোধ করেন, কোনো বন্ধুকে ডেকে পড়িয়ে নিন ওকে দিয়ে।

রেকর্ড প্লেয়ার থাকলে কথাগুলোর সাথে সাথে ধীর লয়ের কোনো ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকও ব্যবহার করতে পারেন, তবে লক্ষ রাখবেন বাজনাটা যেন খুব আস্তে বাজে, মুখ্য কথাগুলোই, বাজনাটা গৌণ।

রেকর্ডটা শোনবার জন্যে এমন একটা স্থান ও কাল বাছাই করুন যে সময়ে বা যেখানে কোনো ধরনের বাধা পড়বে না। আরাম করে আরাম কেদারায় বসুন বা শুয়ে পড়ুন বিছানায়। জামা কাপড় ঢিল করে দিন। এবার স্থির দৃষ্টিতে তাকান কোনো নির্বাচিত বিন্দুর দিকে। স্বাভাবিকভাবে চাইলে চোখটা যেখানে পড়ে তার চেয়ে খানিক উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এইবার টেপ রেকর্ড চালু করে দিন, কিংবা আঙুলের ইশারায় বন্ধুকে বলুন পড়া শুরু করতে। আপনার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন পাঠরত কণ্ঠস্বরের উপর। যা যা করতে বলা হচ্ছে করুন নির্দ্বিধায়।

রেকর্ডের বিষয়বস্তু

কিছুক্ষণের মধ্যেই আশ্চর্য শিথিল এক আরামের আবেশ আসবে তোমার মধ্যে। জীবনে এতো আরামের বিশ্রাম উপলব্ধি খুব কমই হয়েছে তোমার। শরীর মন যতোই ঢিল করে দেবে, যতোই শিথিল করে দেবে, ততোই বেশি হবে আরাম। যেখানটায় তাকিয়ে আছো আরো কিছুক্ষণ চেয়ে থাকো সেদিকেই, লম্বা করে দম নাও একটা।

তারপর ধীরে ধীরে বাতাস বের করে দাও ফুসফুস থেকে। সব বাতাস বের করে দাও। এবার আরেকটা লম্বা শ্বাস টানো। আবার খালি করো ফুসফুস। হ্যাঁ, এই রকম। সব বাতাস বের করে দিয়ে আবার একটা দম নাও আগের মতো। এবার স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকুক শ্বাস-প্রশ্বাস। প্রতিশ্বাসের সাথে সাথে আরো শিথিল হচ্ছে তোমার শরীরের সমস্ত পেশী। যা বলা হচ্ছে মন দিয়ে শোনো, অন্য কোনো দিকে চিত্তবিক্ষেপ না করে একমনে শুনে যাও কথাগুলো। শরীর মন শিথিল করে দাও আরো, আর শোনো। তোমার ভালোর জন্যেই বলা হচ্ছে কথাগুলো।

চোখের পাতা দুটো একটু কাঁপছে হয়তো তোমার। চোখের পলক ফেলতে ইচ্ছে করলে ফেলতে পারো, তবে দৃষ্টিটা যেদিকে স্থির হয়ে আছে সেই দিকেই থাকুক আরো কিছুক্ষণ। হয়তো লক্ষ করছো, চোখের পাতাগুলো একটু ভারি হয়ে আসতে শুরু করেছে। ক্রমে আরো ভারি মনে হবে ওগুলো, খুলে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠবে ক্রমে। বেশ ভারি লাগছে এখন। খানিক বাদেই বুজে আসতে চাইবে পাতা দুটো। বুজে আসতে চাইলে যে-কোনো সময় চোখ বুজতে পারো। একটু পর ওগুলো এতোই ভারি মনে হবে যে খুলে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে, এবং আপনিই বুজে যাবে। এবার বুক ভরে আর একটা লম্বা দম নিয়ে ছেড়ে দাও, ঢিল করে দাও শরীর-মন।

আরামের আবেশ আসবে তোমার মধ্যে একটু পরেই। চমৎকার একটা ঘুমঘুম মোহের আবেশ। হয়তো ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছো, আসতে শুরু করেছে স্বপ্নিল একটা আচ্ছন্ন ভাব। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা সব দূর হয়ে যাচ্ছে তোমার মন থেকে। কোনো কিছুরই তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না, এমনি একটা ভাব আসছে তোমার মধ্যে। একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব। চোখের পাতা দুটো হয়তো আরো বেশি কাঁপছে তোমার। যদি এখনও বুজে গিয়ে না থাকে, বুজে যাক ও-দুটো। চোখ বন্ধ করো। পাতাগুলো খুব ভারি লাগছে, খু-উ-ব ভারি। চোখ বুজে মন দিয়ে শোনো কথাগুলো।

খানিক পরেই আমার কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনো শব্দই ঢুকবে না তোমার কানে।

হয়তো অনুভব করতে পারছো হাত-পাগুলোও ভারি হয়ে এসেছে তোমার। স্বপ্নিল আচ্ছন্ন ভাবটা বাড়ছে আরো। অদ্ভুত আরামের আবেশ আসছে। শরীরের সমস্ত পেশীগুলোকে আরো ঢিল করে দিতে হবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি পেশী শিথিল করে দিতে হবে। একে একে ঢিল করে দাও সব।

প্রথম ডান পা থেকে শুরু করা যাক। ডান পায়ের সমস্ত পেশী শক্ত করে ফেলো। খুব শক্ত। এইবার হঠাৎ ঢিল দাও। হ্যাঁ, পায়ের পাতা থেকে কোমর পর্যন্ত সমস্ত পেশী শিথিল হয়ে গেল। ডান পা'টা ঢিল হয়ে গেল কোমর পর্যন্ত।

এবার বাম পা শক্ত করে ফেলো। আরো শক্ত। হঠাৎ ঢিল দাও। হ্যাঁ। শরীরের নিচের অংশ সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে গেল। এবার তোমার তলপেটের পেশীগুলোও শিথিল করো। তারপর বুক। আবার একবার বুক ভরে শ্বাস নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলো। এর ফলে সারা শরীর আরো শিথিল হয়ে আসবে। ভেরিগুড। এবার পিঠের পেশীগুলো ঢিল দাও। কাঁধ আর ঘাড়ে কি একটু আড়ষ্টতা রয়ে গেছে? মাথা ও পায়ে ভর দিয়ে শরীরটা সামান্য ওপরে তোলো—হাঁটু সোজা রেখে। এবার ঢিল দাও, শিথিল করে দাও। এবার হাত দুটো। ডান হাতের সমস্ত পেশী শক্ত করো, হঠাৎ ঢিল দাও। এবার বাম হাত। শক্ত করে ঢিল দাও। দুই কাঁধ সামান্য একটু ওপরে তোলো, দুই সেকেণ্ড ধরে রাখো, এবার ঢিল করে দাও। কাঁধ থেকে নিয়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে হাত দুটো। আ…হ্! আরা…ম! চমৎকার লাগছে।

সারা মুখে অসংখ্য ছোটো ছোটো পেশী আছে, সেগুলোও ঢিল করে দাও এবার। দাঁতে দাঁত চেপে ভ্রূকুটি করো, আরো জোরে, এবার ঢিল দাও। গাল, চোয়াল, চোখ, কপাল—সব ঢিল হয়ে গেল। পরিপূর্ণ বিশ্রাম। সারা শরীর ঢিল হয়ে গেছে। উদ্বেগহীন, স্বপ্নিল বিশ্রামের রাজ্যে চলে গেছো তুমি। ঝিরঝির ঝিরঝির শান্তির পরশ

লাগছে তোমার গায়ে। আরো গভীর আরামের মধ্যে চলে যাচ্ছো তুমি ক্রমে। দিবা স্বপ্নে বহুবার যেমন কল্পনায় ভর করে অন্য এক জগতে চলে গেছো, ইচ্ছে করলেই তেমনি এক জগতে চলে যাওয়া শিখছো তুমি এখন। শিখে একে অনেক কাজে ব্যবহার করবে তুমি, উপকৃত হবে।

শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হয়েছো তুমি।

সম্মোহন আর কিছুই নয়, তুমি এখন যে অবস্থায় আছো একেই বলে সম্মোহন। এবার খানিকটা কল্পনার সাহায্য নিতে হবে তোমাকে। কল্পনা করে নাও, একটা লম্বা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছো তুমি। সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছো সিঁড়ির ধাপগুলো–নেমে গেছে নিচে। রেলিংটা দেখতে পাচ্ছো স্পষ্ট। আমি দশ থেকে শূন্য পর্যন্ত গুণবো এখন। আমি গুণতে শুরু করলেই তুমি কল্পনায় ধাপের পর ধাপ নামতে শুরু করবে সিঁড়ি বেয়ে। আমি যখন শূন্য গুণবো তখন তুমি নেমে গেছো নিচে। নেমে যাওয়ার ছবিটা স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলবে তুমি কল্পনায়। আমার প্রত্যেকটি গণনা তোমাকে আরো গভীর স্তরে নিয়ে যাবে। প্রত্যেকটা সংখ্যা উচ্চারণের সাথে সাথে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে চলে যাবে তুমি। প্রতিটি ধাপ নামার সাথে সাথে আরো…আরো গভীরে তলিয়ে যাবে।

দশ।

নামতে শুরু করেছো তুমি। প্রত্যেকটি সংখ্যা উচ্চারণের সাথে সাথে আরো গভীরে চলে যাবে। নয়…আট…সাত…ছয়। অনেক গভীরে চলে যাচ্ছো তুমি। আরো…আরো গভীরে। পাঁচ…চার…তিন…দুই। আরো গভীরে। এক…শূন্য। নিচে নেমে গেছো তুমি, পৌঁছে গেছো অনেক গভীরে। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে সাথে চলে যাচ্ছো আরো গভীরে।

শ্বাস-প্রশ্বাসটা হয়তো লক্ষ করেছো। বেশ অনেক ধীরে ধীরে বইছে এখন। আগের চেয়ে বেশ অনেক গভীরভাবে বইছে শ্বাস–অনেকটা ঘুমন্ত মানুষের মতো। শান্ত একটা আরাম, একটা আয়েসের

ভাব এসে গেছে তোমার মধ্যে। দেহমনের সব বাঁধন আরো আলগা করে দাও–ডুবে যাও আরো গভীরে। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে সাথে গভীর থেকে আরো গভীরে।

তুমি এখন সম্মোহিত বিশ্রাম উপভোগ করছো। শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হয়েছো মোহতন্দ্রায়।

তোমার হাত দুটোর প্রতি লক্ষ দাও। খুব সম্ভব বেশ ভারি ঠেকছে ওগুলো তোমার কাছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হয়ে যাবে তোমার ডান হাতটা। পুরোটা হাত হালকা হতে শুরু করবে। অনুভব করতে পারবে ওজন চলে যাচ্ছে ওটার। কল্পনায় নিজের ডান হাতটা দেখো। আঙুলের নখ দিয়ে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে সব ওজন। অনুভব করতে পারছো, ক্রমে হালকা হয়ে আসছে হাতটা। একটু পরেই পুরোটা হাত ওজন শূন্য হয়ে যাবে। পালকের মতো হালকা হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে শূন্যে ভেসে উঠতে শুরু করবে হাতটা। হাওয়ায় ভেসে উপরে উঠতে থাকবে তোমার ডান হাত। এগিয়ে আসবে মুখের দিকে। আরো হাল্কা হয়ে আসছে হাতটা। উপরে উঠতে চাইছে। গ্যাস বেলুনের মতো হালকা হয়ে গেছে ডান হাতটা। এক্ষুণি অনুভব করতে পারবে শূন্যে ভেসে উঠছে হাতটা। হয়তো ইতোমধ্যেই ভেসে উঠতে শুরু করেছে। আরো...আরো উপরে উঠবে হাতটা, আরো। কল্পনার চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো, ভেসে উঠছে, ক্রমে এগিয়ে আসছে হাতটা তোমার মুখের কাছে। স্পর্শ না করা পর্যন্ত চলতে থাকবে হাতটা মুখের দিকে।

কনুইয়ের কাছে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাতটা। আরো উপরে উঠছে। যদি এখনও হাতটা শূন্যে ভেসে উঠতে আরম্ভ না করে থাকে, কয়েক ইঞ্চি শূন্যে তোলো ওটাকে, সামান্য একটু ভাঁজ করো কনুই। বাধা না দিয়ে ওটাকে মুখের কাছে নিয়ে আসার দায়িত্ব ছেড়ে দাও তোমার অবচেতন মনের উপর। আপনিই উঠে আসবে হাতটা। তোমার মুখের কোনো অংশ স্পর্শ করে ফিরে যাবে নিজের জায়গায়। প্রথম দিকে একটু ঝাঁকি অনুভব করবে, তারপর সহজ ভঙ্গিতে উঠে এসে স্পর্শ

করবে মুখের কোথাও। আরো একটু উঠুক হাতটা।

হাওয়ায় ভেসে উপরে উঠে আসছে তোমার হাত। উপরে উঠছে। আরো উপরে। এইভাবে উঠতে উঠতে মুখের কোনো একটা জায়গায় স্পর্শ করবে হাতটা। আরো উঠে আসছে হাত। আরো। আরো, আরো। এবার আগের চেয়ে একটু দ্রুত উঠছে। এগিয়ে আসছে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছো তুমি, এগিয়ে আসছে হাতটা আরো। যতোক্ষণ না মুখ স্পর্শ করছে ততোক্ষণ উঠতেই থাকবে হাতটা। হাতটা যতো উপরে উঠছে, ততোই গভীরে চলে যাচ্ছো তুমি। যতোই গভীরে চলে যাচ্ছো ততোই উপরে উঠছে হাত। মুখ স্পর্শ করবার সাথে সাথে আরো অনেক গভীরে চলে যাবে তুমি। গভীর আরামের আবেশে আচ্ছন্ন হবে।

মুখ স্পর্শ না করা পর্যন্ত হাতটা উপরে উঠবে। স্পর্শ করার পর ফিরে যাবে নিজের জায়গায়। আরো গভীর স্তরে চলে যাচ্ছো তুমি। যেতে থাকো। এই আরামের বিশ্রাম উপভোগ করছো তুমি। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে সাথে চলে যাচ্ছো গভীর থেকে গভীরতর স্তরে। এক্ষুণি হাতের স্পর্শ পাবে তুমি তোমার মুখের কোনো অংশে। তখন ডান হাতটা নামিয়ে ফেলতে পারো।

প্রত্যেকটা কথা শুনতে পাচ্ছো তুমি। সব কিছু সম্পর্কেই সজাগ আছো। আরো খানিকটা ঢিল দাও, আরো খানিক গভীরে চলে যাও। যতোই গভীরে যাবে ততোই বেশি আরাম লাগবে। কেমন একটা ঘুম ঘুম আচ্ছন্নভাব অনুভব করছো তুমি এখন নিজের ভিতর। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। সমস্ত ভাবনা, চিন্তা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সরে গেছে বহুদূরে। কোনো কিছুতেই কিছুই এসে যায় না এখন তোমার। পরিপূর্ণ বিশ্রামের আরাম ঘিরে রেখেছে তোমাকে।

এই কথাগুলো যখনই শুনবে তখনই এমনি চমৎকার আরামের গভীরে চলে যাবে তুমি। কিন্তু তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ তোমাকে সম্মোহিত করতে পারবে না। যতোই অভিজ্ঞতা বাড়বে ততোই দ্রুত গভীরে চলে যেতে পারবে তুমি। তোমার মধ্যে থেকে সমস্ত মানসিক

চাপ দূর হয়ে গেছে, পরিপূর্ণ বিশ্রামের কোলে নিজেকে ঢেলে দিয়েছো তুমি। আরো ডুবে যাও, আরো গভীরে। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে সাথে আরো গভীরতর স্তরে। ক্রমে আরো গভীরে চলে যাচ্ছো তুমি।

সব ধরনের সম্মোহনই আসলে আত্মসম্মোহন। এতোক্ষণ পর্যন্ত যা যা বলা হয়েছে সেই সাজেশনকে মেনে নিয়ে তুমি নিজেকে সম্মোহিত করেছো। অন্যের সাজেশনে তুমি যেভাবে সাড়া দিয়েছো, নিজের সাজেশনেও ঠিক তেমনি ভাবেই সাড়া দেবে। নিজের উপকারের জন্যে তুমি নিজেকে যে সাজেশন দেবে সেটাই মেনে নিয়ে তাতে সাড়া দেবে তোমার অবচেতন মন।

যখন খুশি নিজেকে সম্মোহিত করবার বিদ্যা শিখছো তুমি এখন। আত্মসম্মোহনে কোনোরকম বিপদের সম্ভাবনা নেই–শুধু একটি ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে হবে। কোনো গাড়ি বা যন্ত্র চালাতে গিয়ে যেন আত্ম-সম্মোহিত হয়ে না পড়ো, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। নইলে বিপদ ঘটতে পারে। কারণ সম্মোহিত অবস্থায় সচেতন অবস্থার মতো অতটা সাবধান সপ্রতিভ থাকা অসম্ভব। তাই এখানে তোমাকে সাজেশন দিয়ে রাখছি: গাড়ি বা কোনো যন্ত্র চালনার সময় ঘুমিয়ে পড়া বা সম্মোহিত হয়ে পড়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। যখন গাড়ি বা যন্ত্র চালাচ্ছো তখন শুধু যে সম্মোহিত হয়ে পড়বে না তা নয়, যতোক্ষণ ঐ কাজে আছো পরিপূর্ণ সজাগ, সচেতন ও সতর্ক থাকবে তুমি।

এখন যা যা করেছো প্রায় সেই সবই করতে হবে তোমাকে আত্মসম্মোহন করবার সময়। এখন যে অভিজ্ঞতা হলো, এই রকমই অভিজ্ঞতা হবে। তোমাকে সহজ একটা নিয়ম বলে দেবো, সেটা মনে রাখবে, ঠিক যা যা বলছি তাই করবে–তাহলে খুব সহজেই সম্মোহিত করতে পারবে নিজেকে।

এখন যেমন আরাম করে শুয়ে বা বসে আছো, তেমনি আরামে বসবে বা শোবে। দৃষ্টিটা কোনোকিছুর উপর দু'তিন মিনিট স্থির রেখে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবে তোমার সাজেশনের উপর। কতোক্ষণ

সম্মোহিত থাকতে চাও সে সময় নির্ধারণ করে নিয়ে তোতাপাখির মতো বারবার উচ্চারণ করবে তোমার সাজেশন। চোখের পাতা দুটো ভারি হয়ে এলেই তিনবার বলবে: চোখ বুজে আসছে। চোখ বুজে আসছে। চোখ বুজে গেল। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাবে আপনিই।

সাজেশনগুলো জোরে বলবার হয়তো তোমার দরকার পড়বে না, নিজেকে যা বলতে চাও সেগুলো মনে মনে ভাবলেই চলবে। কিন্তু কেউ কেউ আবার মুখে উচ্চারণ করলে বেশি ভালো ফল পায়। ইচ্ছে করলে জোরে বলে দেখতে পারো ফলোন্নতি হলো কিনা। চোখ বুজে যাওয়ার পর শরীরটাকে আরো ঢিল, আরো শিথিল করে নেবে তুমি আজ যেভাবে করেছো, ঠিক সেই ভাবে। প্রথমে পা থেকে শুরু করবে, একে একে শরীরের সমস্ত পেশী ঢিল করে দেবে। শরীরটাকে যতো শিথিল করবে, ততোই আরাম বোধ করবে, ততোই চলে যাবে গভীরে। শরীরটা ঢিল হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে তিনবার বলবে: 'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও'। এই কথাটা তিনবার বলবার সাথে সাথেই সম্মোহিত হয়ে পড়বে তুমি। যখন নিজের ইচ্ছেয় আত্মসম্মোহিত হতে যাচ্ছো, কেবলমাত্র তখনই এই কথাটা তোমাকে সম্মোহিত করবে। অন্য সময় এই কথাটার কোনো প্রভাব পড়বে না তোমার উপর। 'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও'–কথাটা হাজারবার বললে বা শুনলেও প্রভাবিত হবে না তুমি, যদি না নিজের ইচ্ছায় আত্মসম্মোহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে কথাটা বলো।

ধীরে ধীরে তিনবার নিজেকে বলবে: 'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও'। কথাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সম্মোহিত হয়ে পড়বে তুমি। এবার ডান হাতটা শূন্যে ভেসে উঠে আপনাআপনি স্পর্শ করুক তোমার মুখ। সাজেশন দাও, কল্পনায় দেখো হাতটাকে উপরে উঠে আসতে, স্পর্শ করুক মুখের কোথাও। তারপর হাতটা নামিয়ে রাখো। 'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও' বলবার পর ডান হাতটা উপরে উঠে তোমার মুখ স্পর্শ করা হয়ে গেলেই তলিয়ে যেতে শুরু করবে তুমি সম্মোহনের আরো গভীরে।

তোমার পক্ষে যতোটা সম্ভব ততোটা গভীর স্তরে পৌঁছুতে হলে নিজেকে বলো–'আরো গভীরে চলে যাচ্ছো তুমি!' এই কথাটি ধীরে ধীরে তিনবার বলো, সেই সাথে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাওয়ার কাল্পনিক ছবি দেখো। এবার আর সংখ্যা গণনার দরকার নেই। খুব ধীরে ধীরে তিনবার নিজেকে বলো: 'আরো গভীরে চলে যাচ্ছো তুমি,' সেই সাথে ধাপের পর ধাপ নেমে গভীর স্তরে চলে যাও। মনের চোখে দেখো ঘটনাটা, সিঁড়িটা দেখো, রেলিং দেখো। সিঁড়িটা কাঠের না কংক্রিটের, মোজাইক করা না সাধারণ সিমেন্ট, কয়েক ধাপ নামার পর বাঁক আছে কিনা, উপরের ল্যাণ্ডিং থেকে কি একটা বালব্ ঝুলছে?– এইসব খুঁটিনাটি আগেই ভেবে নাও, সিঁড়িটা স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলো মনের পর্দায়। প্রত্যেকটা ধাপ নামার সাথে সাথেই সম্মোহনের আরো গভীরে চলে যাবে তুমি। প্রথম দিকে অভ্যাসের সময় অন্তত বারতিনেক এই সিঁড়ি বেয়ে নামা ভালো। সেক্ষেত্রে কল্পনা করে নিতে পারো চারতলা থেকে নামছো তুমি, একেকবার একেক তলা। প্রত্যেক তলা নামার সাথে সাথে ক্রমে গভীরতর স্তরে চলে যাবে তুমি। বারদশেক অভ্যাসের পর একবার নামলেই যথেষ্ট হবে–একবারেই তোমার গভীরতম স্তরে পৌঁছে যাবে তুমি। সেখানে পৌঁছে একমনে পুনরাবৃত্তি করতে থাকো তোমার সাজেশনের সারসংক্ষেপ।

মনে রাখবে শরীরটাকে যতো শিথিল করে দেবে, ততোই আরামবোধ করবে, ততোই চলে যাবে গভীরে। যতো গভীরে যাবে, ততোই শিথিল হবে শরীর–মন, ততোই আরামবোধ করবে। মাঝে মাঝে গভীর শ্বাস নেবে, এর ফলে আরো গভীরে চলে যাবে। এখন একবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারো, এর ফলে আরো গভীরে চলে যাবে তুমি।

যখন আত্মসম্মোহিত অবস্থায় রয়েছো, তখন যদি এমন কিছু ঘটে যেজন্যে তোমার জেগে ওঠা দরকার–ফোন বাজছে, কেউ দরজার কড়া নাড়ছে, কিংবা আগুন ধরে যাওয়া বা ঐ জাতীয় কোনো বিপদ উপস্থিত হয়েছে–তৎক্ষণাৎ জেগে উঠবে তুমি। পূর্ণ সজাগ, পূর্ণ

সচেতন অবস্থায় ফিরে আসবে তুমি মুহূর্তে।

কিন্তু সেরকম কোনো জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হলে যখন জেগে উঠতে চাও তখন শুধু নিজেকে একবার বলবে, 'এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণলেই জেগে উঠবে তুমি'। তারপর এক, দুই, তিন করে পাঁচ পর্যন্ত গুণে যাও। পাঁচ বলবার সাথে সাথেই চোখ দুটো খুলে যাবে তোমার। জেগে উঠে খুব ভালো লাগবে তোমার কাছে, মনে হবে গভীর বিশ্রাম নিয়ে উঠলে। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়ে মনে হবে সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছো।

আত্মসম্মোহনকে অনেক কাজে ব্যবহার করে উপকৃত হবে তুমি। তুমি যখন যে কাজের জন্যেই সাজেশন দাও না কেন, তোমার অবচেতন মন গ্রহণ করবে সে সাজেশন এবং সেই মতো কাজ করবে।

সম্মোহিত অবস্থায় অনেক সময় সময়ের হিসাব রাখা যায় না, কখনো চট্ করে অনেক সময় পার হয়ে যায়। কখনো আবার খুব বেশি ক্লান্ত থাকলে সম্মোহিত অবস্থা থেকেই স্বাভাবিক ঘুমে ঢলে পড়ে কেউ কেউ। এটা বন্ধ করতে হলে প্রথমেই একটা সময়সীমা স্থির করে নেয়া উচিত। ঠিক সময় মতো তোমাকে জাগিয়ে দেবার ভার অবচেতন মনের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারো। সময় হলেই সম্মোহনের যতো গভীর স্তরেই থাক না কেন তোমার অবচেতন মন জাগিয়ে দেবে তোমাকে।

আত্মসম্মোহন একবার শেখা হয়ে গেলে চিরকাল রয়ে যাবে ক্ষমতাটা তোমার মধ্যে। নিয়মগুলো ভুলবে না তুমি কিছুতেই, যখনই প্রয়োজন তখনই সম্মোহিত করতে পারবে তুমি নিজেকে। তবে চর্চা একেবারে ছেড়ে না দিয়ে মাঝে মাঝে আত্মসম্মোহনের অভ্যাস রাখবে তুমি সারা জীবন। বিদ্যাটার চর্চা রাখলে শরীর-মন ভালো থাকবে তোমার।

এবার জেগে উঠবে তুমি। আমি যখন পাঁচ পর্যন্ত গুণবো তখন জেগে উঠবে সম্মোহন থেকে। জেগে উঠে চমৎকার লাগবে তোমার কাছে। সজীব বোধ করবে, পরিপূর্ণ বিশ্রামের পর যে তাজা একটা

খুশি খুশি ভাব হয় সেটা অনুভব করবে তুমি। পাঁচ বলবার সাথে সাথেই সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় চোখ মেলবে তুমি। এক–সম্মোহনের গভীর থেকে উঠে আসছো তুমি। দুই–জেগে উঠছো ক্রমে। তিন–আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে সজাগ হয়ে উঠছো। চার–চোখের পাতা খুলবার আগের মুহূর্তে চলে এসেছো তুমি। এরপর পূর্ণ বিশ্রামের ভাব নিয়ে পূর্ণ সজাগ হয়ে চোখ মেলবে তুমি। পাঁচ।

যখন খুশি

সম্মোহিত অবস্থায় নিজেকে সাজেশন দেবেন আপনি, সাজেশনগুলো হতে পারে বিভিন্ন ধরনের। শুধু সম্মোহিত অবস্থায় নয়, দৈনন্দিন জীবনে আপনি নিজেকে সাজেশন দিতে পারেন যখন খুশি, তাতেও ফল পাবেন।

যে অবজেকটিভের উপর বর্তমানে কাজ করছেন আপনি তার সারমর্ম লিখুন কাগজে, তারপর সারমর্মটাকে সংক্ষিপ্ত করুন দুটো কি একটি লাইনে। আপনার সারমর্মের সংক্ষিপ্ত লাইনটি প্রতিজ্ঞা-সূচক হলে ভালো হয়।

লাইনটি যখনই সময় পাবেন, উচ্চারণ করুন মনে মনে। সারাদিন যখন ইচ্ছা, যখনই মনে পড়বে, আওড়ান। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক নম্বর কাজ হোক লাইনটি বারবার আওড়ানো। সারাদিন কাজের ফাঁকেও পুনরাবৃত্তি করুন। ঘুমুতে যাবার আগে বিশেষ করে বেশিবার আওড়ান, পুনরাবৃত্তি করুন। পঞ্চাশ কিংবা একশোবার মুখস্থ বলুন লাইনটা। তোতাপাখির মতো।

নির্দিষ্ট অবজেকটিভের জন্যে নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা-সূচক লাইন বেছে নেবেন আপনি। একই ধরনের প্রতীকধর্মী বুলি সব অবজেকটিভের বেলায় ব্যবহার করবেন না।

আপনার সুবিধার্থে আপনার সম্ভাব্য অবজেকটিভের জন্যে কিছু সাজেশনের নমুনা দিচ্ছি আমি। আপনি এগুলো সচেতন অবস্থায় ব্যবহার করতে পারবেন। কাঠামোটা মোটামুটি এই রকম রেখে

নিজের ইচ্ছেমতো শব্দ যোগ বা বিয়োগ করতে পারেন।
আপনার সম্ভাব্য অবজেকটিভ:

গাড়ি

গাড়ির মালিক হতে চান আপনি। কিন্তু হাতে যথেষ্ট টাকা নেই, ইচ্ছা থাকলেও আজই শো-রুমে গিয়ে একটা গাড়ি কেনা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। টাকা নেই, তাই বলে কি গাড়ি কেনা হবে না?

হবে না নয়, হবে।

প্রথমে ঠিক করুন, কি ধরনের গাড়ি চান আপনি। শো-রুমে যান, দেখে শুনে একটা গাড়ি পছন্দ করুন। গাড়ি পছন্দ করার সময় ভাববেন না যেন ওই গাড়িটা আমার হলে ভালো হতো, ভাববেন ওই গাড়িটা আমার হবে, ওটার মালিক হবো আমি। যে-জিনিস আপনি জানেন আপনার হবে, আপনি সংগ্রহ করতে পারেন সে জিনিসের জন্যে আপনি আশা করেন না, কেউ তা করে না। আশা করার মধ্যে সন্দেহের বীজ রয়েছে।

গাড়িটা পছন্দ করা হয়ে গেলে আপনি আপনার বিশ্বস্ত, সাহায্যকারী অবচেতন মনকে কাজে নামিয়ে দেবেন। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত যতোবার সময় এবং সুযোগ পান, মনে মনে নিচের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করুন:

'একটা...গাড়ি কিনবো আমি—আমার অবচেতন মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমি এমন একটা পথ খুঁজে পাবো যে পথ ধরে এগোলে গাড়িটি পাবো আমি, কোনো ধরনের আর্থিক চাপের সম্মুখীন না হয়েও।'

নিজের একটি ব্যবসা

নিজস্ব একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়া আপনার বহু দিনের মনের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকে ইচ্ছা মনে করবেন না এখন থেকে। ওটা আপনার একটা বৃহত্তর অবজেকটিভ।

সাজেশনগুলোর একমাত্র কাজ, আপনার অবচেতন মনকে আপনার অবজেকটিভের প্রতি সদয়, সহানুভূতিশীল হতে বাধ্য করা, তাকে আপনার অবজেকটিভের প্রেমে পড়তে বাধ্য করা। অবচেতন মন যদি আপনার অবজেকটিভের প্রেমে পড়ে, পথ দেখাবে সে, উপায় বাতলে দেবে আপনাকে কিভাবে কি করলে সেটি অর্জনে সফল হতে পারেন। যাবতীয় করণীয় করতে হবে আপনাকেই, অবচেতন মনের কাছ থেকে আপনি শুধু পথের হদিস পাবেন। কিভাবে কি করলে ফল ফলবে তাও আপনি জানেন, কিন্তু ভুলে যান, তাই অবচেতন মন আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব নেবে।

নিম্নোক্ত সাজেশন দিন আপনার অবচেতন মনকে, আপনার অবজেকটিভের ধরন বা প্রকৃতি অনুযায়ী এই সাজেশন একটু এদিক-ওদিক বা যোগ-বিয়োগ করতে পারেন আপনি।

'আমার চিন্তা-ভাবনা এবং কাজের দ্বারা আমি পরিচালিত হচ্ছি নিজস্ব একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবার দিকে। নিজস্ব একটি ব্যবসা দেখাশোনা করার মতো যোগ্যতা এবং উপযুক্ততা আমার মধ্যে আছে। আমার সাফল্য আমাকে সুযোগ দেবে মানুষকে সুখী করতে।'

উত্তম স্বাস্থ্য

আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, নিজেই নিজের ডাক্তার হতে যাবেন না। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেকেরই উচিত শরীরটাকে চেক-আপ করানো। কোনো রকম ত্রুটি বা গোলযোগ যদি ধরা পড়ে, চিকিৎসার ভার দেয়া উচিত তাঁকেই যিনি তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন অপরের জীবন বাঁচাবার কাজে—অর্থাৎ আদর্শ একজন ডাক্তারকে।

অধিকাংশ অসুস্থতা মনের ব্যাপার। অসুস্থ হয়ে পড়বো, এই ভয় থেকেই বেশিরভাগ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

নিজের সাজেশনটা ব্যবহার করবেন আপনি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে: 'আমার স্বাস্থ্য দিনে দিনে ভালো হচ্ছে। ভালো খাচ্ছি, ব্যায়াম করছি, কাজ করছি, যথাসময়ে বিশ্রাম নিচ্ছি, খেলাধুলা করছি, ভালো আছি

সুস্থ আছি–থাকবোও।'

পারিবারিক শান্তি

বাড়িতে যদি শান্তি না থাকে কারো, পৃথিবীর কোথাও শান্তি নেই তার জন্যে।

পারিবারিক অশান্তির অনেক কারণের মধ্যে প্রধান হচ্ছে একঘেয়েমি। স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের কাছে আকর্ষণীয় থাকতে ব্যর্থ হয়, আকর্ষণ না থাকায় কেউ কারো মধ্যে বৈচিত্র্য খুঁজে পায় না এবং বৈচিত্র্যহীনতাই একঘেয়েমির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরস্পরকে নিয়ে করার কিছু পায় না তারা, তাই 'নেই কাজ তো খই ভাজ'-এর মতো তারা ঝগড়া করে, একজন আর একজনকে ব্যঙ্গ করে, স্বামী ভিলেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, স্ত্রী বেছে নেয় ডাইনীর ভূমিকা।

স্বামীর উচিত, উচিত নয়, কর্তব্য, তার চিন্তায়, কাজে, সাফল্যে, আনন্দে স্ত্রীকে সাথী করে নেয়া। গঠনমূলক কাজে দু'জন মিলিতভাবে মন দিলে সবরকম ঝগড়াফ্যাসাদ পালাতে দিশে পাবে না।

স্বামী বা স্ত্রী, একজন অপরজনকে ভুলের জন্যে দোষারোপ করবেন না। দোষ দিন নিজেকে। নিজেকে বলুন: আমাদের বিবাহিত জীবনটাকে সুখের করার জন্যে আরো অনেক কিছু করবো আমি।

সাজেশন নিন:

'ওকে ভালবাসতে কার্পণ্য করবো না। মুখের ভালবাসা নয়, কাজে প্রমাণ করবো আমি, ওকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি।

আমি সুখ চাই, তাই ওকে সুখী করা সবচেয়ে আগে দরকার আমার। ওর সুখই আমার সুখ।'

অভ্যাস পরিত্যাগ

নিজেকে জানবার চেষ্টা করুন। জানুন আপনার মধ্যে ভালো গুণ কি আছে, খারাপ গুণ কি কি আছে। নিজেকে আপনি ভাবুন দেহসহ একটি মন নয়, মনসহ একটি দেহ। মনই সব। মনই আপনি।

আপনার মনের বাসগৃহ দেহ। সুতরাং দেহকে অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ দেবেন না। দেহ যেন আপনাকে শাসন না করে বা নির্দেশ না দেয়, এটা করো ওটা করো।

এমন কোনো অভ্যাস যদি আপনার থাকে যা অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ– ব্যয়সাপেক্ষ শুধু অর্থনৈতিক অর্থে নয়, মানসিক এবং দৈহিক ক্ষতিসাধনের অর্থে–সে অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে আপনাকে। আপনি নিজেই নিজের কর্তা, আর কেউ নয়–এই সত্য জানুন, তাহলেই খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারবেন। নিজেই নিজের কর্তা মানে আপনার পরিচালক আপনিই, কিভাবে জীবন যাপন করবেন তা শুধুমাত্র আপনিই ঠিক করবেন। আপনার বদভ্যাসগুলোকে সে অধিকার কেন দেবেন? দেবেন না।

আপনার মধ্যে কি অভ্যাস থাকবে কি অভ্যাস থাকবে না তা নির্ধারণ করবে কে? অবশ্যই আপনিই।

বদভ্যাসগুলোর ক্রীতদাস নন আপনি এই সত্যবোধ নিজের মধ্যে আমদানী করতে হলে নিম্নোক্ত সাজেশন দিতে হবে নিজেকে:

'নিজের রুচি এবং ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে আমার। সেইসব কাজই আমি করবো যা আমার শরীর, মন এবং মেজাজের জন্যে সুফলদায়ক। জীবনটা আমার, আমিই তার পরিচালক। জীবনের জন্যে ক্ষতিকর যে অভ্যাস তা আমি পরিত্যাগ করবো।'

নিজের একটি বাড়ি

পৃথিবীর বুকে এক খণ্ড জমি, আরামে বসবাস করার জন্যে তার উপর সুদৃশ্য একটা বাড়ি–এটা প্রায় সবলোকেরই একটা কাম্যবস্তু।

জীবনের মান আপনার উন্নত হবে, সেই সাথে আপনার দরকার হবে একটা নতুন, আরো আধুনিক বাড়ির। এই বিশেষ বাড়িটি স্থান পাবে আপনার কাম্যবস্তুর তালিকায়। কাম্যবস্তুর তালিকায় এই বাড়িটির স্থান দিলেই হবে, পদ্ধতি অনুযায়ী এগোতে হবে,–ব্যস, মালিক হবেন বাড়িটির। তালিকায় স্থান দেয়া মানেই নেচারের

সাহায্য কামনা করা, এবং নেচার বা প্রকৃতি আপনাকে সাহায্য করার জন্যে অপেক্ষা করছে, আপনি তার সাহায্য চাইলেই সাহায্য করবে সে।

এর আগে আপনি জেনেছেন, আপনার কাম্যবস্তুটি সম্পর্কে পরিষ্কার এবং বিশদ জ্ঞান থাকতে হবে আপনার মধ্যে। শুধু বাড়িটি দরকার মনে করলেই হবে না, আপনাকে বাড়িটির আকার, আয়তন, অবস্থান, ধরন, আনুষঙ্গিক সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ হতে হবে।

নতুন একটা বাড়ির মালিক হতে যাচ্ছি আমি–এই বিশ্বাস নিজের মধ্যে আমদানী করুন। নিজেকে সাজেশন দিন:

'আমি আমার কর্ম এবং চিন্তা দ্বারা নতুন একটি বাড়ির মালিক হওয়ার পথে এগোব। ঠিক যেখানে চাই, যে-ধরনের চাই, যে-মূল্যে চাই সেই ধরনের একটি বাড়ির মালিক হতে যাচ্ছি আমি। ঘুমে জাগরণে স্বপ্নে আমি বাড়িটার মালিক হবার জন্যে উৎসাহিত করবো নিজেকে।'

আরো ভাল একটা চাকরি

অধিকাংশ মানুষ এমন জিনিসের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় যা তাদের পাওয়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। অনেকে আরো ভালো পেশা খুঁজে বেড়ায় কিন্তু সে জানে না তার বর্তমান পেশাটাই সবচেয়ে সবদিক থেকে ভালো।

পেশাতে নৈপুণ্য অর্জন করার চেষ্টা করুন। যে পেশায় নিযুক্ত আছেন সেই পেশার দ্বারা আরো লভ্যাংশ বের করার কৌশল আবিষ্কার করুন। নতুন চাকরি বা ব্যবসা খোঁজার আগে তলিয়ে দেখে নিন বর্তমান চাকরি বা ব্যবসা থেকে আরো বেশি কিছু আদায় করা সম্ভব কিনা। চাকরি ক্ষেত্রে আন্তরিক হোন, সততা বজায় রাখুন, অল্প সময়ে বেশি সার্ভিস দিন, কাজ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষের সুনজর আকর্ষণ করুন। নিজেকে কাজের লোক, মূল্যবান কর্মী প্রতিপন্ন করুন। মনে রাখবেন, কর্তৃপক্ষকে কাজ দ্বারা খুশি করলে কর্তৃপক্ষ আপনার সুবিধা-অসুবিধার

প্রতি আন্তরিক হবেন, আপনাকে তারা খুশি করার চেষ্টায় ত্রুটি করবেন না।

পেশাগতভাবে উন্নতি চাইলে নিজেকে এই সাজেশন দিন:

'আমার চিন্তা এবং কর্ম আমাকে পথ দেখাবে পেশাগত জীবনে আরো সৎ হতে, আরো আন্তরিক হতে এবং আমি কর্তৃপক্ষের কাছে কাজের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাবো। পদোন্নতির জন্যে কাজ করবো আমি, আরো খাটবো- মূল্যবান একজন মানুষ হিসেবে যাতে সবাই আমাকে দাম দেয়।'

সমস্যা এবং সমাধান

যথোপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে কোনো সমস্যাই আসলে সমস্যা নয়। সমস্যাকে বিপদ মনে করাটা নেতিবাচক মনোভাবের লক্ষণ, যা আপনার জন্যে অভিশাপ বিশেষ। সমস্যা কখনোই বিপদ নয়। সমস্যাকে ধাঁধা বলা যেতে পারে, যে ধাঁধার উত্তর আপনারও জানা আছে, চিন্তা করলেই মনে পড়ে যাবে। ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামানো কি ক্লান্তিকর বা কষ্টকর? মোটেই নয়। এ কাজটা মজার, আনন্দদায়ক।

সমস্যাকে সমস্যা বা বিপদ বলে মনে করবেন না। তা মনে না করতে হলে নিজেকে এই রকম সাজেশন দেবেন:

'জীবনের হাজারো ধরনের সমস্যাগুলো আসলে কৌতুকপ্রদ ধাঁধা ছাড়া আর কিছু নয়। কোনো সমস্যাই বিপদ নয়। নিজের বুদ্ধির উপর দৃঢ় আস্থা আছে আমার। সেই বুদ্ধি ব্যবহার করে আমি সমস্যা নামক ধাঁধার উত্তর পাবো।'

কথা দিয়ে মন জয়

সমবেত মানুষের উদ্দেশে কথা বলতে ভয় পায় অনেকে। অথচ কয়েক শত বা কয়েক হাজার মানুষের উদ্দেশে কথা বলা যা একজন মানুষের সাথে কথা বলাও তাই, দুটোর মধ্যে এতোটুকু পার্থক্য নেই।

একজন মানুষের বুদ্ধি এবং বিচার ক্ষমতা যতোটুকু, এক হাজার

বা আরো বেশি লোকের বুদ্ধি এবং বিচারক্ষমতা তার চেয়ে কোনো অংশেই বেশি নয়। সুতরাং সংখ্যাধিক্য দেখে ঘাবড়াবার সঙ্গত কোনো কারণ নেই।

কথা বলবার সময় আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি যাদের উদ্দেশ্যে কথা বলছেন তারা আপনার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান নয়, কিংবা আপনার শত্রু নয়। আপনি হয়তো জানেন না, কিন্তু একটা সত্য ব্যাপার হলো এই যে শ্রোতারা আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্যে মানসিক দিক থেকে সম্মত হয়ে বসে আছে।

সমবেত মানুষের উদ্দেশে কথা বলতে অভ্যস্ত হবার জন্যে নিজেকে এই রকম সাজেশন দিন: 'সত্যিই আমি ভালবাসি মানুষকে এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলবার কথা আমার প্রচুর পরিমাণে আছে। আমি জানি শ্রোতারাও আমাকে ভালবাসে, আমার প্রতি তাদের আস্থা, বিশ্বাস এবং সহানুভূতি আছে। আমি কথা বলবো মুক্ত মন নিয়ে, প্রাঞ্জল ভাষায়, শ্রুতিমধুর কণ্ঠে। শ্রোতারাই আমাকে কথা বলতে প্রেরণা যোগাবে।'

সেলসম্যানশিপ

যারা দোকানে বসে বা ঘুরে ফিরে জিনিসপত্র বিক্রি করে সাধারণত তাদেরকেই সেলসম্যান বলা হয়। কিছু বিক্রি করতে হলে, যুক্তি দিয়ে জিনিসটির গুণাগুণ বোঝাতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে প্রতিপক্ষ বা বিরুদ্ধপক্ষ মনে না করে, তারা আপনার সাথে কি রকম প্রতিকূল ব্যবহার করবে তা ভেবে ভেবে কাহিল না হয়ে অটো-সাজেশনের উপর নির্ভর করুন, অটো-সাজেশনের নিয়ম-কানুন মেনে চলুন। দৃঢ় মনোবল গ্রহণ করুন, বুক চিতিয়ে দাঁড়ান, ঘোষণা করুন নিজের উদ্দেশে এই কথাগুলো: 'আমি একজন অভিজ্ঞ সেলসম্যান। যখন কোনো নির্দিষ্ট বস্তু কারো কাছে বিক্রি করতে চাই তখন বস্তুটির ভালো দিকগুলো সম্পর্কে জানা থাকে আমার, কিভাবে কথা বললে সুফল ফলবে বুঝতে পারি আমি।'

ভীরুতা বা সঙ্কোচবোধ থেকে নিষ্কৃতি

ভীরুতা বা সঙ্কোচবোধ নামক রোগ থেকে মুক্তি পাবার সহজতম উপায় হলো এই রোগটাকে হালকাভাবে গ্রহণ করা। বক্তব্যটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে নাও হতে পারে, কারণ, ভয় বা সঙ্কোচবোধ বহু মানুষকে সারা জীবন ধরে অকথ্য কষ্ট দেয়, যন্ত্রণা দিয়ে ভোগায়। কিন্তু, সত্য হলো, এই রোগের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভের সহজ উপায় সত্যি আছে।

মনকে বদলাবার উপর নির্ভর করছে সবকিছু। নিজেকে ভীরু বলে মনে না করে আত্মবিশ্বাসী, সাহসী বলে মনে করুন, সুফল পাবেনই।

নিজেকে ভীরু করে রেখেছেন, নিজেকে ভাবছেন ভীরু,–ফলে আরো খারাপ হচ্ছে আপনার অবস্থা, আপনি অধিকতর ভীরু হয়ে উঠছেন।

ভীরুতা কাটিয়ে উঠতে চাইলে একটা কাজই করতে হবে আপনাকে, বিপরীতধর্মী চিন্তা-ভাবনার আশ্রয় নিন।

ভীরুতা আপনাকে দমন করে রেখেছে। ভীরুতার জন্যেই আপনি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছেন না। ভীরুতা আপনার জীবনকে করে তুলেছে অভিশপ্ত। এই রোগ থেকে মুক্তি চান আপনি।

উপায়, নিজেকে ভীরু বলে মনে না করা। এই রোগের এই একটাই চিকিৎসা, নিজেকে কোনোক্রমেই সঙ্কুচিত হতে দেবেন না, ভয় পাবেন না কাউকে কিছু বলতে, কারো সামনে কিংবা কোথাও যেতে, কোনো কিছু পেতে বা পাবার আশা করতে।

সকালে এবং রাতে ঘুমাবার আগে নিজেকে এই সাজেশন দিন:

'ভালবাসি এই পৃথিবীকে। এই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আর সকলের যেমন আছে, আমারও তেমনি আছে। মানুষের মধ্যে বেঁচে আছি আমি একজন সচেতন এবং আত্মবিশ্বাসী মানুষের মতো–আর সব মানুষের মতো। অন্যকে সুখী করা মানুষের কর্তব্য, আমারও কর্তব্য অন্যকে সুখী করা। অন্যকে সুখী করে আমিও সুখী হবো। আগ্রহ এবং উৎসাহ সৃষ্টি করার মতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী

আমি, সুতরাং যে বিষয়েই বলতে চাই না কেন, সবাই আমার কথা শুনবে এবং বিশ্বাস করবে এবং আমার সাথে একমত হয়ে একটা চুক্তিতে উপনীত হবেই।'

আত্মশাসক

এই বই লেখাই হয়েছে আপনার মতো একজন পাঠককে আত্মশাসক হওয়া শেখাবার জন্যে। আপনি আত্মশাসক, তার মানে এই নয় যে আপনি আপনার দেহের শাসক। আত্মশাসক বলতে আমি বোঝাচ্ছি, মনের শাসক। মনকে যে সৎ পথে, সুপথে, অনুকূল পথে চালাতে পারে সেই প্রকৃতপক্ষে আত্মশাসক। কারণ, মন ছাড়া যে দেহ তাকে মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু বলা যায় না–মানুষ সেই যার দেহের ভিতর একটা সজীব মন আছে।

ইতিমধ্যে আমরা শিখেছি যে সাফল্য এবং সুখ ব্যাপার দুটো সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা ছাড়া আর কিছু নয়। সাফল্য লাভ করার আগে নিজেকে সফল বলে মনে করতে হবে–এটা অন্যরকম জরুরী শর্ত।

এ থেকে প্রমাণ হয় নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করতে চাইলে আমাদেরকে আগে পরিবর্তন করতে হবে মনোভঙ্গি।

নিজের শিক্ষক বা আত্মশাসক হতে চাইলে নিজেকে এই সাজেশন দিন, কাজ হবে: 'আমার অস্তিত্বের বাহক আমার মন। আমার মনের অভিভাবক আমি নিজে। আমার মন যা চিন্তা করে সেই চিন্তার নিয়ন্ত্রক আমি, স্রষ্টা আমি। যা চিন্তা করি এবং যে কাজ করবো বলে ভাবি এবং করি তা আমার দ্বারা নির্ধারিত, অনুমতিপ্রাপ্ত এবং প্রশংসিত হয়। নিজেকে শাসন করে, নিজেই নিজের শিক্ষক হয়ে আমি প্রতিদিন সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।'

দুশ্চিন্তামুক্তি

যে অবস্থায় পড়তে চান না সেই অবস্থায় পড়ে গেছেন–এই বিশ্বাসই

দুশ্চিন্তার মূল কারণ, বলছেন বেন সুইটল্যাণ্ড।

এই বইয়ের সর্বত্র আপনাকে জানানো হয়েছে, আপনি যে অবস্থায় পড়তে চান, যে অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে চান সেই অবস্থায় পৌঁছে গেছেন এই বিশ্বাস নিজের মধ্যে কিভাবে গড়ে তুলবেন।

কোনো একটা সমস্যায় পড়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন–এইরকম অবস্থায় আপনাকে বলা উচিত হবে না সমস্যাটার কথা ভুলে যান। আমার পরামর্শ হলো, সমস্যাটাকে নয়, দুশ্চিন্তাটাকে বিদায় করুন। দুশ্চিন্তাকে গলাধাক্কা দিয়ে মন থেকে বের করে দেবার সর্বোত্তম উপায় হলো, সমস্যাটাকে সমাধানের যোগ্য বলে মনে করা।

যে-কেউ জানে, সকল সমস্যারই সমাধান আছেই আছে। সমাধানটা বের করার জন্যে চিন্তা করুন, বেরিয়ে যাবে সমাধান। মিটে যাবে সমস্যা।

সমস্যা যতো বড়ই হোক, সে যেন আপনাকে দিশেহারা করে না তুলতে পারে। সমস্যায় পড়ে যে লোক ঘাবড়ে যায় তার আসলে নিজের উপর বিশ্বাস এবং আস্থা নেই। সে নিজের যোগ্যতার উপর সন্দিহান-প্রমাণ হয় এ থেকে।

কিন্তু আপনি তো অযোগ্য নন। আপনার মধ্যে নিজের সম্পর্কে বিশ্বাস এবং আস্থার কোনো অভাব নেই। আপনি কেন কোনো সমস্যাকে সমাধানযোগ্য বলে মনে করবেন না?

যে-কোনো সমস্যাই আপনার বুদ্ধির দ্বারা, চিন্তার দ্বারা, মেধার দ্বারা, আন্তরিক ইচ্ছার দ্বারা সমাধানযোগ্য, এই বিশ্বাস নিজের মধ্যে আনুন। সমস্যার সমাধান পেতে হলে কি করতে হবে আপনাকে? গঠনমূলক চিন্তা-পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে আপনাকে। সব চিন্তাই ফলপ্রসূ নয়। ফল প্রসব করে যে চিন্তা তাকে বলা যেতে পারে গঠনমূলক চিন্তাধারা।

গঠনমূলক চিন্তাধারার অধিকারী হবার জন্যে ক্ষুদ্রতর-বৃহত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করলে কাজ হবে। নিম্নোক্ত সাজেশন ব্যবহার করলে আপনার মন দুশ্চিন্তামুক্ত তো হবেই, গঠনমূলক চিন্তা করার পথও

পরিষ্কার হয়ে যাবে:

'আমি যোগ্য এবং উপযুক্ত, কোনো সমস্যাই আমাকে হাস্যকর অবস্থায় ফেলতে পারবে না। আমার মন দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখবো কারণ, বুদ্ধিমান, যোগ্য, উপযুক্ত লোকেরা দুশ্চিন্তায় কক্ষনো ভোগে না। আমার অচেতন মন চিন্তা এবং সক্রিয়তার দ্বারা আমাকে দুশ্চিন্তার কবল থেকে মুক্ত রাখতে সরাসরি সাহায্য করবে।'

লেখক হবেন কিভাবে

'লেখক হবার ইচ্ছা আছে আমার, কিন্তু আমি জানি লেখক আমি হতে পারবো না।'–এক যুবক বললো আমাকে।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন পারবে না? লিখতে কখনো চেষ্টা করেছো?'

'লাভ কি চেষ্টা করে! এ লাইনে আমার মেধা নেই।' ঘোষণার ভঙ্গিতে জানালো সে।

পুরো এক ঘণ্টা ধরে যুবকটিকে আমি বোঝালাম যে তার লেখক হবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা সে নিজেই।

লেখক হতে পারবো না, মেধা নেই–এই নেতিবাচক চিন্তা যার মধ্যে আছে সে লেখক হতে পারবে কি করে?

লেখক হতে চান? বেশ, ভালো কথা। আমার শুভেচ্ছা রইলো আপনার প্রতি। এবং সেই সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করছি, লেখক আপনি হবেন। কিন্তু শর্ত হলো, নিয়ম মানতে হবে। এবং পরিশ্রম করতে হবে। রাজি?

গুড।

নিয়ম একটিই, প্রথমে বিশ্বাস করুন আপনি লেখক হতে পারবেন। লেখক হবার জন্যে যে সব গুণ দরকার তার সবগুলোই প্রচুর পরিমাণে আপনার মধ্যে আছে।

ব্যস! এই নিয়মটি পালন করুন, ফল পাবেনই। সেই সাথে এই সাজেশনটিকে ব্যবহার করুন:

'লিখতে আমি ভালবাসি এবং লিখতে আমি পারিও। পারি, তার কারণ আমার মধ্যে কল্পনাশক্তি রয়েছে। সেই সাথে লেখার মাধ্যমে নিজেকে আমি সুন্দরভাবে, ঠিক যেমনভাবে চাই, প্রকাশ করতে পারি। আমি লিখতে পারি সহজ এবং কৌতূহলোদ্দীপক ভঙ্গিতে। আমার লিখতে ভালো লাগে, তাই লিখি। লিখে আমি নিজেকে প্রকাশ করি এবং নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে প্রচুর আনন্দ পাই। আমি একজন ভালো লেখক।'

সুখ

মনের বিশেষ একটা অবস্থার নাম: সুখ। আমাদের সুখ ব্যক্তি বা বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়, ব্যক্তি এবং বস্তুর প্রতি আমাদের মনোভাবের উপর নির্ভরশীল।

সাজেশন:

'আমি সুখী। আমার ভালো স্বাস্থ্যের জন্যে আমি সুখী। আমি দিনে দিনে সামনের দিকে এগুচ্ছি এবং উন্নতি করছি–তাই আমি সুখী। দুনিয়াতে কিছুকাল উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি সুখী। আমি মানুষ, তাই আমি সুখী। আমি সুখী বলে মনে করি নিজেকে, তাই আমি সুখী! আমি সুখী!'

পরিশেষ

কিভাবে কি করলে কি হবে এখন তা আপনি জানেন। নতুন করে বলবার মতো কিছু নেই আর। দরকারও নেই। যা শিখেছেন, যে-কোনো ধরনের সাফল্য অর্জনের জন্যে সেটা যথেষ্ট। এই নিয়ম বাস্তবে প্রয়োগ করে ইচ্ছে করলেই এখন আপনি হতে পারেন দেশবরেণ্য নেতা, প্রখ্যাত শিল্পী, মস্ত লেখক, বিরাট বড়লোক–মোট কথা, যা খুশি। হতে পারেন সার্থক, সমৃদ্ধ, আনন্দোজ্জ্বল জীবনের অধিকারী; সুখী একজন মানুষ।

কিন্তু হবেন কি?

যদি হন, আপনার সাথে সাথে সুখী হবো আমিও।

আপনি খ্যাতিমান হোন, অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হোন, সুখী হোন–আপনার সুখে সুখী হবো আমিও।

বইটি লিখেছি আপনার জন্যে। এ বইয়ের মাধ্যমে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছি আমি আপনার দিকে। এই বাড়িয়ে দেয়া হাত যদি আপনি গ্রহণ করেন, কৃতার্থ হবো আমি। আপনার উন্নততর নতুন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, আপনার হাসি-খুশি-সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরপুর আগামী জীবনের প্রতিটি আনন্দঘন মুহূর্তে জানবেন, আমার শুভেচ্ছা রয়েছে আপনার সাথে।

ধন্যবাদ।

***

আত্মউন্নয়ন

সুখ-সমৃদ্ধি

বিদ্যুৎ মিত্র

আপনি সাফল্য চান?

এই বইয়ে আমি নিশ্চিত সাফল্য লাভের একটি সহজ ফর্মুলা প্রকাশ করেছি। এই জাদুবিদ্যার সাহায্যে আপনি সুখ অর্জন করবেন, পাবেন আরও টাকা, আরও সম্মান, পূরণ করবেন আপনার মনের সবগুলো শখ-সাধ-ইচ্ছা-অভিলাষ। এই বইতে যে ফর্মুলা আপনি শিখবেন সেটিকে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ বলতে পারেন। পদ্ধতিটা যে সত্যি কাজের, বুজরুকি বা ধোঁকাবাজি নয় তার সবচেয়ে বড় সাক্ষী আমি, বিদ্যুৎ মিত্র। এটাকে কাজে লাগিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি আমি। আপনিও পাবেন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০